মজার খেলা ক্রিকেট

বিনয় মুখোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—পৌষ, ১৩৬০

প্রকাশক

জে. এন. সিংহ রায

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

২২, ক্যানিং স্ট্রীট

কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট ও চিত্রাঙ্কন

অজিত গুপ্ত

মুদ্রক

বণজিৎ কুমাব দত্ত

নবশক্তি প্রেস

১২৩, লোয়ার সাবকুলাব বোড

কলিকাতা-১৪

দু' টাকা আট আনা

—সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি—

আর্ট প্লেটে মুদ্রিত এলেক বেডসারের ছবিটি ব্রিটিশ ইনফরমেশান সার্ভিসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আয়ান ক্রেগ ও রে-লিণ্ডওয়ালের ছবি দুটি মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন "অস্ট্রেলিয়ান নিউজ য়্যাণ্ড ইনফরমেশান ব্যুরো।"

পি. সেনের স্টাম্পিং; অমরনাথের আউট ও মানকাদের বোলিং-এর ছবিগুলির জন্যে যথাক্রমে ইংলণ্ডের "স্পোর্টস য়্যাণ্ড জেনারেল," "এসোসিয়েটেড ফটোস" ও "পি-এ রয়টার্স"-এর নিকট ঋণস্বীকার প্রয়োজন।

তথ্য সংকলন, চিত্র সংগ্রহ, চিত্রাঙ্কন, ও মুদ্রণ বিষয়ক নানা বিষয়ে এবারও সহায়তা করেছেন একাধিক সহৃদয় ক্রিকেট নিয়ামক, সমালোচক, সাংবাদিক, টেস্ট ক্রিকেটার, ক্রিড়ানুরাগী ও শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ। তাঁদের নামের সুদীর্ঘ তালিকার মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য;—সর্বশ্রী পঙ্কজ গুপ্ত, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেবী সর্বাধিকারী, প্রবীর সেন, দাতু ফাদকার, পঙ্কজ রায়, রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অজিত গুপ্ত, বিভূতি গুহ ও প্রমথনাথ পাল।

"মজার খেলা ক্রিকেট" ইতি পূর্বে প্রকাশিত "খেলার রাজা ক্রিকেট"-এরই সগোত্র। একটি অপরটির পরিপূরক বলাই বিধেয়। প্রথম পুস্তিকার ভূমিকায় তা'র উদ্দেশ্য ও রচনা রীতি সম্পর্কে যা' বলা হয়েছে, বর্তমান পুস্তিকা সম্পর্কেও তা' সমান প্রযোজ্য।

সর্বশ্রীমান

ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

চিত্তরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

পরিমল গঙ্গোপাধ্যায়

রূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

কলকাতা :: সাত'ই জানুয়ারী :: উনিশ শ' চুয়ান্ন

সূচী

বোলার ও ব্যাটসম্যানের যুদ্ধ ... ১
ডিরেক্‌শান ও লেংথ ... ৫
বোলিং-এর মূল কৌশল ... ১৩
গ্রিপ ... ১৫
রান-আপ ... ১৭
ডেলিভারী ... ১৯
ফলো-থ্রু ... ২৩
ফাস্ট বোলিং ... ২৮
সুইং বোলিং ... ৩৫
ইন সুইঙ্গার ... ৩৮
আউট সুইঙ্গার ... ৪১
স্লো বোলিং ... ৪৩
অফ ব্রেক ... ৪৬
লেগ ব্রেক ... ৫২
টপ স্পিন ... ৫৭
গুগলী ... ৫৯
মিডিয়ম পেস বোলিং ... ৬৩
বাঁ-হাতি বোলার ... ৬৫
ফিল্ড সাজানো ... ৬৮
বোলার যেন মনে রাখে ... [illegible]
ফিল্ডিং ... ৮৮
উইকেট কীপিং ... ৯৯
ক্রিকেটের গল্প ... ১০৬
বলতে পারো ... ১১৩
সঠিক উত্তর ... ১১৬
চিত্র-পরিচয় ... ১১৮
ক্রিকেটের অভিধান ... ১১৯

মজার খেলা ক্রিকেট

যে-সব ছবির নীচে কিছু লেখা নেই,
সেগুলির পূর্ণ বিবরণ এক শ' আঠারো
পৃষ্ঠায় চিত্র-পরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

বোলার ও ব্যাটসম্যানের যুদ্ধ

সাইকেলের যেমন দুটো চাকা, কাঁচির যেমন দু'খানা ফলা ক্রিকেটেরও তেমনি দুটি ভাগ,—ব্যাটিং আর বোলিং। একটা না হলে শুধু অন্যটা কাজে লাগে না। দুটোই সমান দরকারী।

অথচ বেশীর ভাগ সময়ই দেখা যায়, ব্যাটিং-এর উপর লোকের যতখানি নজর, বোলিং-এর উপরে ততখানি নয়। ছোট ছেলেরা খেলতে গিয়ে কে আগে ব্যাট করবে আর কতক্ষণ ব্যাট করবে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। বল দেওয়াটাকে তারা মনে করে শুধু খেটে মরা। বয়স্ক লোকেরাও সাধারণতঃ ভালো ক্রিকেটার বলতে বোঝেন একজন ওস্তাদ ব্যাটসম্যান। যারা খেলা দেখতে যান তাঁরা যে-ব্যাটসম্যান রান তুলছে তার যতটা সুখ্যাতি করেন, যে-বোলার রান তুলতে দিচ্ছে না তার ততটা নয়। বোলিং-এর চাইতে ব্যাটিং-এর কদরটাই যেন বেশী।

আসলে কিন্তু ক্রিকেটে ব্যাটিং-এর চাইতে বোলিং-এর গুরুত্ব এতটুকু কম নয়। কারণ ব্যাটসম্যানেরা যত বেশী রানই করুক না কেন, বোলারেরা বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের আউট করতে না পারলে তো খেলা জেতা যায় না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে,—ব্যাটসমেন সেভ ম্যাচেস, বোলারস উইন দেম। মানে ব্যাটসম্যানেরা বাঁচায় হার, বোলারেরা জেতে ম্যাচ! কথাটা মিথ্যা নয়। গত বছর বিলাতের টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ডের

কাছে হেরেছে তা ট্রুম্যানের মারাত্মক বোলিং-এর ফলে, হাটন বা গ্রেভনীর ব্যাটিং-এর জন্যে নয়। অস্ট্রেলিয়া এবার হেরে গিয়েছে বেডসারের বলে। গত যুদ্ধের পরে টেস্ট খেলাগুলিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে জিতেছে রামাধীন, ভ্যালেণ্টাইন এবং লিণ্ডওয়াল, মীলারের জন্য। আগের দিনেও বিলাতের মরিস টেট্ ও হ্যারল্ড লারউড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিল ওরিলী ও ক্ল্যারী গ্রিমেট তাঁদের দলকে অনেক টেস্ট ম্যাচ জিতিয়েছেন।

বোলারের কৃতিত্বটা যে সহজে লোকের চোখে পড়ে না তার প্রধান কারণ এই যে, বোলিং-এর খুটিনাটি বোঝা বেশ শক্ত। ব্যাটসম্যান যখন বলটাকে বাউণ্ডারীতে পাঠায়, তখন তা খালি চোখেই দেখা যায়। ব্যাটসম্যান 'হুক' করেছে, কি, 'কাট' করেছে অত-শত না বুঝলেও বাহবা দেওয়া চলে। বেল উড়িয়ে বা স্টাম্প উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত বোলারের বাহাদুরিটা সাধারণ লোকের কাছে স্পষ্ট হয় না। এমন কি, বল মারতে গিয়ে ব্যাটসম্যানেরা যখন ক্যাচ তুলে আউট হয়, তখনও বেশীর ভাগ দর্শক তা ব্যাটসম্যানের বোকামি মনে করে, বোলারের দক্ষতা নয়। বোলার যে নানা রকম কায়দায় বলটাকে মাটিতে পিচ খাওয়ায়, সুইং বা স্পিন করায়, সে-সব সূক্ষ্ম ব্যাপার মাঠের বাইরে বসে ফিল্ড গ্লাস ছাড়া শুধু চোখে প্রায়ই দেখা যায় না, আর খেলা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান না থাকলে বোঝাও যায় না। কাজেই ভালো ব্যাটসম্যান যতটা হাততালি পায় ভালো বোলার ততটা নয়।

খেলোয়াড়দের মধ্যেও বেশীর ভাগই বোলিং-এর চাইতে ব্যাটিং-এ বেশী মন দেয়। তার একটা কারণ,—ভালো বোলার

হওয়া খুবই শক্ত। ভগবান যাকে বোলার হওয়ার উপযুক্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা দেননি, তার পক্ষে সত্যিকার ওস্তাদ বোলার হওয়া প্রায় অসম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত বড় ক্রিকেটারই স্বীকার করেছেন যে, ভালো বোলারেরা সবাই জন্মে, তৈরী হয় না। বিলাতের জ্যাক হবস্ (এখন যিনি সার জন হবস্) বলেন, "কেমন করে একটা ভালো স্ট্রোক করতে হয়, সেটা একজন ক্রিকেটারকে শিখিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কেমন করে একটা মারাত্মক বল দিতে হয়, তা কাউকে শেখানো চলে না।" ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন আর্চি ম্যাকলারেন বলতেন, "খেলা শিখতে যার খুব আগ্রহ আছে, এমন একজন কিশোরকে যদি ঠিকমতো শেখানো যায়, তবে অবিরত অভ্যাস করে সে ব্যাটিং-এ খুবই উন্নতি লাভ করতে পারে। কিন্তু একজন সত্যিকার ওস্তাদ বোলার হতে হলে আগ্রহ, শিক্ষা ও অভ্যাস ছাড়া আরও কিছু থাকা চাই। সে হচ্ছে য়্যাপ্টিচিউড অর্থাৎ বল দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা।"

গান-বাজনার সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টা বোঝা আরও সহজ হবে। ব্যাটিং হচ্ছে,—সেতার, এস্রাজ, পিয়ানো, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের মতো। প্রতিভা না থাকলেও অনেকদিনের অভ্যাসে সেগুলি বাজাতে শেখা যায়। বোলিং হলো,—গান। গলায় সুর না থাকলে হাজার চেষ্টায়ও গায়ক হওয়া যায় না।

অনেকেই হয়তো ভাববে, বোলার যদি তৈরী করা না চলে, তবে আর বোলিং শেখাবার চেষ্টা কেন? তার জবাবে আবার সঙ্গীতের তুলনাটাই দিতে হবে। গলায় সুর না থাকলে গাইয়ে হওয়া যায় না এ যেমন সত্যি, শুধু গলায় সুর থাকলেই যে বড়

গাইয়ে হয় না এও তেমনি জানা কথা। সুরালো লোককেও অনেক দিন ধরে গলা সাধতে হয়, রাগ-রাগিনী শিখতে হয়, তাল লয় অভ্যাস করতে হয়। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র বা পঙ্কজ মল্লিককে সৃষ্টিকর্তা গানের গলা দিয়েছেন। শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা তাঁরা তাঁদের সেই স্বাভাবিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়েছেন। তাই তাঁরা আজ এমন নামজাদা গায়ক। যে সকল তরুণ খেলোয়াড়ের মধ্যে বোলিং-এর য়্যাপ্টিটিচিউড আছে, তারা যদি বই পড়ে, অন্যকে বল দিতে দেখে, বা কোচের কাছে বোলিং শেখে এবং যথেষ্ট প্র্যাকটিস করে তবেই তারা ভবিষ্যতে সুদক্ষ বোলার হতে পারবে।

কিন্তু বোলিং প্র্যাকটিস সুরু করার আগে একটা কথা ভালো করে বোঝা দরকার,—বোলারের কাজ কী। ব্যাটসম্যানের উদ্দেশ্য যেমন আউট না হয়ে রান করা, বোলারের উদ্দেশ্য তেমনি ব্যাটসম্যানকে রান করতে না দেওয়া এবং আউট করা। আসলে ক্রিকেট খেলাটাই হলো ব্যাটসম্যান আর বোলারে যুদ্ধ। ব্যাটসম্যানের অস্ত্র হলো ব্যাট, আর বোলারের অস্ত্র,—বল। যুদ্ধে নানা ফন্দী-ফিকির খাটিয়ে শত্রুকে কাবু করতে হয়। ব্যাটসম্যানকে অসুবিধায় ফেলতে বোলারও নানা ভাবে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যাটসম্যানকে সে বলের ধরন বুঝতে দেয় না, লোভ দেখিয়ে বিপদে ফেলে, ব্যাটসম্যানের দুর্বলতা বুঝে নিয়ে সেদিক দিয়ে আক্রমণ করে। কাজেই বোলার শুধু কলের মত বল দিয়ে গেলেই উইকেট পায় না, তাকে অনেক মাথা খাটাতে হয়। এ জন্যেই ইংরেজীতে বলে—"এ বোলার ডাজ নট বোল উইথ হিজ আর্ম ওনলী, হি বোলস উইথ হিজ হেড অলসো।"

ডিরেক্‌শ্যান ও লেংথ

পাড়াগাঁয়ে ছেলেরা পাঠশালা থেকে বাড়ি ফেরার সময় ঢিল ছুঁড়ে পথের ধারের গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে খায়। কোনো কোনো ছেলে আছে যাদের তাক খুব নির্ভুল, ঢিল ছুঁড়লেই পেয়ারা বোঁটা ছিঁড়ে টুপ করে তলায় পড়ে। আবার কারো বা কেবল ঢিল ছোঁড়াই সার হয়, একটাও ফল মেলে না। তার কারণ পেয়ারার গায়ে লাগাতে প্রথমে ঢিলটাকে উপযুক্ত দূরত্বে ছোঁড়া চাই। এই দূরত্বকে ইংরেজীতে বলে লেংথ (length)। দূরত্ব বেশী হলে ঢিল পেয়ারা ছাড়িয়ে উঁচু দিয়ে চলে যাবে। কম হলে তার নাগালই পাবে না। আর চাই নিশানা। ইংরেজীতে তাকে বলে ডিরেকশান (direction)। ডিরেকশান ঠিক না হলে লেংথ উপযুক্ত হলেও ঢিল পেয়ারাটার ডাইনে বা বাঁয়ে গিয়ে পড়বে, তার গায়ে লাগবে না।

বোলিং আসলে ঢিল ছোঁড়ারই রকমফের। ইট পাটকেলের বদলে বোলার একটা নির্দিষ্ট মাপের বল ছোঁড়ে। অবশ্য পাঠশালার ঐ ছেলেদের মতো সে যতখানি ইচ্ছা কাছে এগিয়ে বা যে-কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে বল ছুঁড়তে পারে না। স্টাম্পের পাশে কয়েকটা দাগের ভিতর থেকে তাকে বল দিতে হয়। যে-ভাবে ইচ্ছা সে-ভাবে ছোঁড়াও চলে না, হাত ও পা কখন

কোথায় কী ভাবে থাকবে তার নিয়ম বাঁধা আছে। তা হলেও মোটামুটি বলা যেতে পারে যে, ছেলেদের ঢিল ছোঁড়ার লক্ষ্য যেমন গাছের ফল, বোলারের বল দেওয়ার লক্ষ্য তেমনি উল্টো দিকের উইকেট। কাজেই বোলারের পক্ষেও সব চেয়ে দরকারী হলো লেংথ ও ডিরেকশান। এই দুটোকে একসঙ্গে ইংরেজীতে বলে য়্যাকিউরেসী (accuracy)। বোলারের য়্যাকিউরেসী না থাকলে সুইং, স্পিন আর যত গুণই থাক না কেন, সমস্তই বৃথা।

এক দিক দিয়ে কিন্তু ছেলেদের ঢিল ছোঁড়া আর বোলারের বল দেওয়ার মধ্যে একটা মস্ত তফাৎ আছে। সেটা এই যে, গাছের ডালে পেয়ারা আর নীচে মাটিতে ছেলেদের মাঝখানে আর কোনো আড়াল নেই। বোলার আর উইকেটের মধ্যে আছে স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান। সে তার ব্যাট চালিয়ে বল থেকে উইকেট আগলে রাখে। কাজেই সাধারণ ঢিল ছুঁড়ে পেয়ারা পাড়ার মতো স্টাম্পের উপরে বলটা ফেলার চেষ্টা করলে উইকেট ভাঙ্গবে না। বোলারকে নানা রকম কৌশল করতে হয় যাতে ব্যাটসম্যানের ব্যাট এড়িয়ে বলটা গিয়ে উইকেটে লাগে।

সেই কৌশলের প্রথম ধাপ হলো এমন ভাবে বল দেওয়া যাতে তার ডিরেকশানটা উইকেট-মুখো হবে কিন্তু সোজা গিয়ে স্টাম্পের উপরে না পড়ে আগে একবার ব্যাটসম্যানের সামনে মাটিতে পড়ে শেষে স্টাম্পের দিকে যাবে। ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানের সামনে এই মাটিতে বল ফেলার নাম পিচ খাওয়ানো। পিচ খাওয়ানোর সুবিধা এই যে, তাতে বলটা এদিক ওদিক বেঁকে যায়। কোনোটা ছিটকে উপরে ওঠে, কোনোটা বা

লাটিমের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে উইকেটের দিকে ছোটে। ফলে বল ব্যাটসম্যানের ব্যাটের এ-পাশ ও-পাশ বা উপর-নীচ দিয়ে গ'লে উইকেটে লাগে। বোলার বিভিন্ন আঙ্গুল ও হাতের কব্জি নানা ভাবে মোচড় দিয়ে, বা বলের সেলাই করা অংশ—ইংরেজীতে যাকে বলে সীম (seam)—তা কাজে লাগিয়ে ইচ্ছা মতো এই লাফানো, বাঁকানো ও ঘুরপাক খাওয়া কম-বেশী করতে পারে। পরে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত করে বলবো।

বোলার কোনো সময়েই পিচ না খাইয়ে বল দিবে না, এমন নয়। প্রত্যেক ম্যাচেই বোলার দু-একটা বল একেবারে সোজা স্টাম্পের উপর ফেলতে চেষ্টা করে। তাকে বলে ফুল টস (full toss)। ব্যাটসম্যান যখন প্রথম ব্যাট করতে নেমেছে, টাইমিং-এ ভুল করে সে তখন একটা ফুল টস বলে অনেক সময় আউট হয়ে যায়। কিন্তু বোলার প্রায় সর্বদাই বলকে মাটিতে পিচ খাইয়ে নেয়। কারণ মাটিতে না পড়লে বলটা তেমন বেঁকে যায় না। বোলিং-এ লেংথ বলতেও বোঝায় বোলারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বলটা যেখানে পিচ খাচ্ছে সেই দূরত্বটুকু।

একদিক দিয়ে ঢিল ছুঁড়ে পেয়ারা ফেলবার চাইতে বোলারের কাজটা অনেক কঠিন। অন্যদিক দিয়ে বোলারের আবার কতগুলি সুবিধাও আছে। সব চেয়ে বড় সুবিধা এই যে, বলটা স্টাম্পে না লাগিয়েও সে তার কাজ হাসিল করতে পারে। কারণ বোলারের আসল উদ্দেশ্য হলো ব্যাটসম্যানকে আউট করা। বল দিয়ে স্টাম্পের মাথার বেল ফেলে দেওয়া আউট করার একটা

ভালো উপায় সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই একমাত্র উপায় নয়। তা ছাড়া বোলার একা নয়, তার সঙ্গে একজন উইকেট কীপার আর ন'জন ফিল্ডার মাঠে আছে যারা নানাভাবে ব্যাটসম্যানকে আউট করার কাজে তাকে সাহায্য করে।

মোটামুটি এই ক'টা উপায়ে একজন ব্যাটসম্যান আউট হয় :—

১। বোল্ড (bowled) অর্থাৎ বোলার যখন বল দিয়ে উইকেট ভেঙ্গে দেয় ;

২। কট্ (caught) অর্থাৎ ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লেগে বলটা যখন শূন্যে উঠেছে তখন ফিল্ডারদের মধ্যে কেউ যদি তা লুফে নেয় ;

৩। স্টাম্পড্ (stumped) অর্থাৎ ব্যাটসম্যান বলটাকে পিটাতে গিয়ে যখন তার পিছনের পা পপিং ক্রীজের বাইরে নিয়ে গিয়েছে তখন উইকেট কীপার যদি বল ছুঁড়ে উইকেট ভেঙ্গে দেয় ;

৪। হিট উইকেট (hit wicket) অর্থাৎ ব্যাটসম্যান যদি বল পিটাতে গিয়ে ব্যাট বা নিজের শরীরের কোনো অংশের ঘায়ে স্টাম্পের মাথা থেকে বেল ফেলে দেয় ;

৫। রান আউট (run out) অর্থাৎ রান নেওয়ার সময় ব্যাটসম্যান পপিং ক্রীজের ভিতরে তার ব্যাট রাখার আগেই যদি ফিল্ডার বল ছুঁড়ে উইকেট ভেঙ্গে দেয়।

ছোট ছেলেদের খেলায়, বা স্কুলের ম্যাচে অনেক ব্যাটসম্যানই বোল্ড আউট হয় বটে। কিন্তু বড়দের খেলায়,
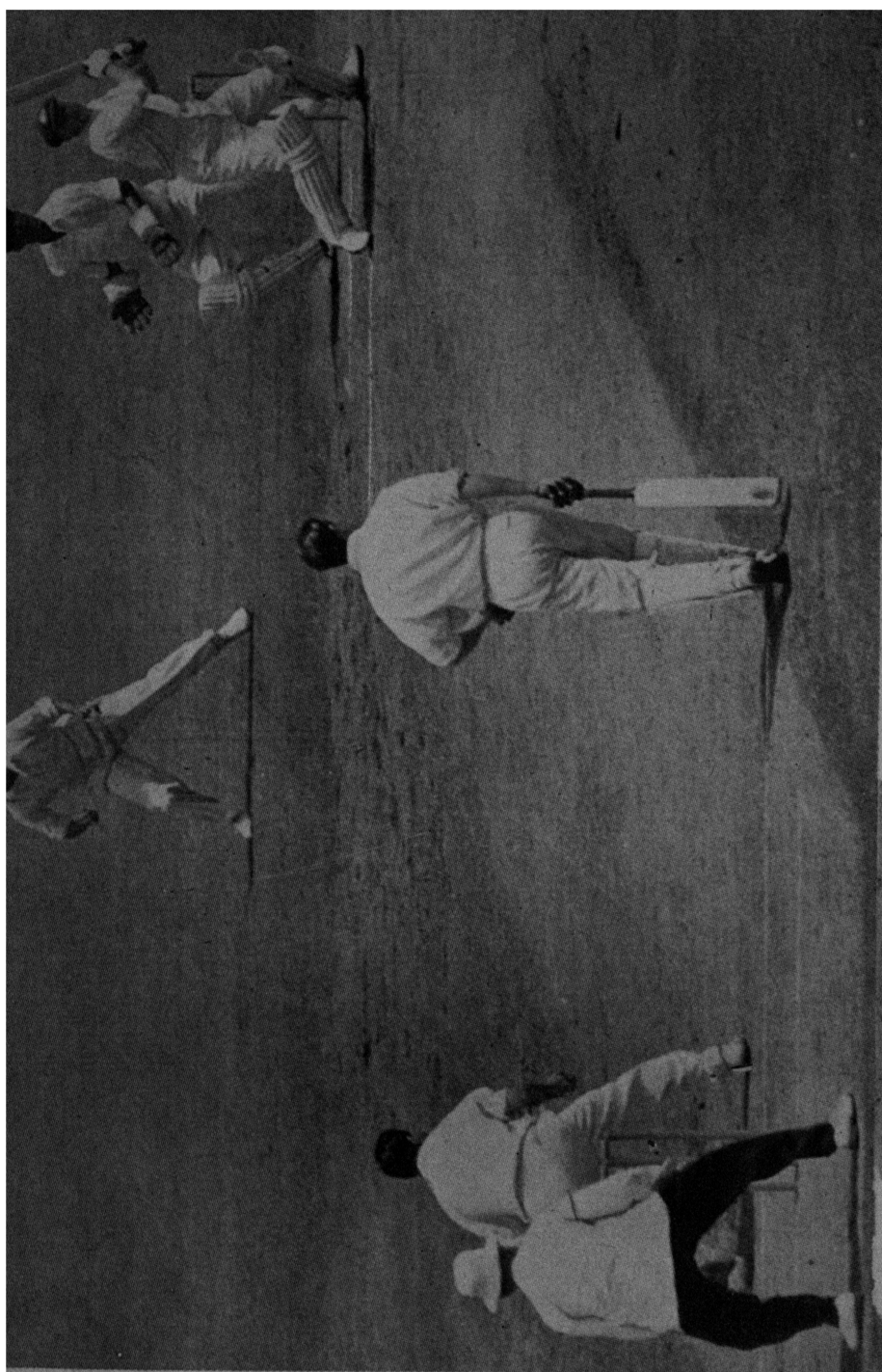
বিশেষ করে পাকা ব্যাটসম্যানেরা যখন খেলে, তখন বোল্ড আউটের সংখ্যা কম হয়। বিলাতের বিশেষজ্ঞরা অনেক পরীক্ষা ও হিসাব করে দেখতে পেয়েছেন যে, সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এক শ' জন ব্যাটসম্যানের মধ্যে মাত্র তেত্রিশ জন হয় বোল্ড আউট। পঞ্চাশ জন কট আউট। ন' জন এল. বি. ডব্লিউ। বাকী আট জন স্টাম্পড্ ও রান আউট।

এতক্ষণ যে পাঁচ রকম আউটের কথা বলেছি তার একমাত্র শেষেরটা বাদ দিলে আর সবগুলিতেই কিন্তু বোলারের হাত থাকে। ক্যাচ লোফাটা ফিল্ডারের কৃতিত্ব, স্টাম্পড্ করতে পারা উইকেট কীপারের বাহাদুরি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বোলারকেই এমনভাবে বল দিতে হয় যাতে ক্যাচ ওঠে, বা ব্যাটসম্যান এগিয়ে মারতে গেলে বল ফস্কে যায়। যে-সময় ব্যাটে লাগানো উচিত তার আগেই যখন ব্যাটসম্যান ব্যাট চালায়, কিম্বা হঠাৎ বেঁকে যাওয়ার জন্য বলটা যখন ব্যাটের মাঝখানে না লেগে কিনারায় লাগে তখনই ক্যাচ ওঠে। হিট উইকেটও বেশীর ভাগ হয় তখন, যখন বোলার এমন বল দেয় যা মারতে গিয়ে ব্যাটসম্যান শরীরের ভারসাম্য অর্থাৎ ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে।

এর আগে বলা হয়েছে যে, বোলিং-এর পক্ষে সব চেয়ে দরকারী হলো সঠিক ডিরেকশান ও লেংথ। এখন কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করবে, বলটা যদি সোজা স্টাম্পের উপরে না ফেলা হয়, তবে লেংথ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী? প্রথমে পিচ খেয়ে তারপরে স্টাম্পে গিয়ে লাগবে এই যদি উদ্দেশ্য, তবে ব্যাটসম্যানের সামনে যে-কোনো জায়গায় বলটা পিচ খেলেই তো

চলে। তা' হলে কোনো বলকে "গুড লেংথ" আর কোনো বলকে "ব্যাড লেংথ" বলারই বা মানে কী ?

এ বই-এর গোড়াতেই বলা হয়েছে বোলার আর ব্যাটসম্যানে সর্বদাই একটা লড়াই চলতে থাকে। বোলার যেমন ব্যাটসম্যানকে আউট করবার জন্য বলটাকে পিচ খাইয়ে বাঁকিয়ে, ঘুরিয়ে, লাফিয়ে দেয়, ব্যাটসম্যানকেও তেমনি সে-বিপদ কাটাবার জন্য উপযুক্ত কায়দা বের করতে হয়। সে-কায়দার একটা হলো বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে বলটা যেখানে পিচ খাচ্ছে সেখানেই ব্যাট এগিয়ে ধরা, যাতে বলটা পিচ খেয়েই ব্যাটের গায়ে লাগে। বেঁকে বা সরে যাওয়ার আর অবকাশ না পায়। দ্বিতীয় উপায় হলো ডান পা পিছিয়ে নিয়ে বলটা বেঁকে কোন দিকে যাচ্ছে তা ভালো করে দেখে' সে অনুযায়ী ব্যাট চালানো।

বলটা যদি ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি পিচ খায়, তবে সে-বলের নাম হয় হাফ ভলী (half volley)। ব্যাটসম্যান প্রথম উপায়ে সে-বল ঠেকায়। তাকে বলে ফরোয়ার্ড প্লে (forward play)। আর যদি বলটা ব্যাটসম্যান থেকে অনেকটা দূরে পিচ খায়, তবে তাকে বলে শর্ট পিচ বা লং হপ (long hop)। ব্যাটসম্যান তখন পিছিয়ে খেলে' সে-বল আটকায়। "খেলার রাজা ক্রিকেট" বইতে এ-বিষয়টা খুব বিস্তৃত করে বলা হয়েছে। এগারো নম্বর পৃষ্ঠায় এক নম্বর ছবিটা দেখলে কোনখানে পিচ খেলে বলের কী নাম হয় তা বোঝা যাবে।

মোটের উপর এইটে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যাটসম্যানকে বিপদে ফেলতে হলে এমন বল দিতে হবে যা এগিয়ে খেলা উচিত, কি,

পিছিয়ে খেলা উচিত তা নিয়ে ব্যাটসম্যানকে ভাবনায় পড়তে হয়। ব্যাটসম্যান দোমনা হলেই ঠিক সময়ে ও ঠিকভাবে ব্যাট বলে লাগাতে পারে না। তার ফলে, হয় বল ফস্কে গিয়ে স্টাম্প উড়িয়ে নেয়, নয় তো ব্যাটের আনাচে-কানাচে লেগে ক্যাচ ওঠে।

১ নং ছবি।
কোন্ বল কোথায় পিচ খায়।
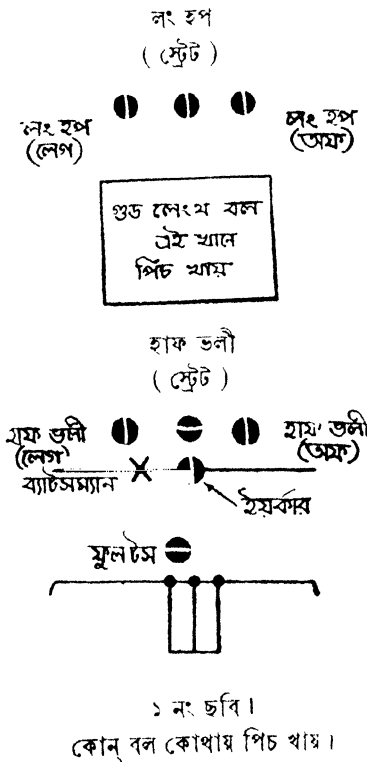
সুতরাং ব্যাটসম্যানের পক্ষে অসুবিধার বল হলো সেটি, যেটি হাফ ভলী আর লং হপের মাঝামাঝি জায়গায় পিচ খায়। সেটিই হলো গুড লেংথ বল।

ঠিক কোনখানটায় পড়লে বল গুড লেংথ, তা পিচের মধ্যে ইঞ্চি মেপে দাগ কেটে দেওয়া চলে না। কারণ একজন বেঁটে ব্যাটসম্যানের সামনে বলটা যেখানে পিচ খেলে তাকে গুড লেংথ বলা হবে, একজন খুব লম্বা ব্যাটসম্যানের বেলায় সেখানে পিচ খেলে তা আর গুড লেংথ নয়। কারণ সে তার লম্বা পা বাড়িয়ে দিয়ে অনেকটা দূরে ব্যাট এগিয়ে ধরতে পারে। সুতরাং তার কাছে ঐ বলটা হয়ে দাঁড়ায় হাফ

ভলী। ব্যাটসম্যানের খেলার ধরন অনুসারেও বলের লেংথ কম বেশী করতে হয়। যে-ব্যাটসম্যান ব্যাক প্লেতে কাঁচা, তার কাছে একটু শর্ট অর্থাৎ লং হপ বলই হবে গুড লেংথ। আর ফরোয়ার্ড খেলাটা যার ভালো আসে না, সেই ব্যাটসম্যানের পক্ষে একটু হাফ ভলী বলই হয়ে দাঁড়াবে গুড লেংথ।

বলের গতি দিয়েও গুড লেংথ বলের পিচ খাওয়ার জায়গাটার অদল বদল হবে। খুব ফাস্ট বল ব্যাটসম্যান থেকে একটু বেশী দূরে পড়লেও গুড লেংথ। কিন্তু স্লো বল সেখানে পিচ খেলে হবে লং হপ।

খেলার পিচটার উপরেও গুড লেংথের রকম ফের নির্ভর করে। মাটি এবং তার উপরে ঘাসের অবস্থা ইত্যাদির জন্য কোনো পিচে বলটা পিচ খেয়ে অনেকটা আস্তে হয়ে যায়। সেখানে বলকে গুড লেংথ করতে হলে ব্যাটসম্যানের একটু বেশী কাছে ফেলতে হবে। আবার যে-পিচে বল পড়ে' বলের গতি বেড়ে যায়, সে পিচে বলটাকে একটু পিছিয়ে অর্থাৎ ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে বেশী দূরে ফেলতে হবে।

বোলিং-এর অন্য সূক্ষ্ম কৌশলগুলি না জেনেও শুধু লেংথ বজায় রেখে একজন বোলার ব্যাটসম্যানকে অনেকক্ষণ দাবিয়ে রাখতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় পিচ খুব শক্ত। নাম-করা স্লো বোলারেরাও সেখানে বলকে সর্বদা খুব বেশী স্পিন খাওয়াতে পারে না। বিলাতের উইলফ্রেড রোডস ও জে. সি. হোয়াইট সেখানে শুধু গুড লেংথ বল দিয়েই অনেক চৌকশ ব্যাটসম্যানকে অসুবিধায় ফেলেছেন।

বোলিং-এর মূল কৌশল

একদল বোলার আছে যারা খুব জোরে বল দেয়। তাদের বলে ফাস্ট বোলার। অন্যদল স্লো বোলার, তারা বল দেয় খুব আস্তে। আর একদল আছে এই দু'-এর মাঝামাঝি। তাদের বল ফাস্ট বোলারের চাইতে আস্তে অথচ স্লো বোলারের চাইতে জোরে। তাদের নাম মিডিয়ম পেস বোলার। এই তিন জাতের মধ্যেও আবার রকমারি আছে। কোনো বোলার বেশীর ভাগ দেয় ইন সুইঙ্গার, কোনো বোলার দেয় আউট সুইঙ্গার। কেউ দেয় টপ স্পিন। কারো বল অফ ব্রেক, কারো লেগ ব্রেক, কারো বা গুগলী।

কিন্তু বল যে রকমেরই হোক না কেন, প্রত্যেক বোলারকেই প্রথমে কয়েকটা মূল কায়দা শিখতে হয়। সেগুলিকে বলে বেসিক য়্যাকশান (basic action)। বেসিক য়্যাকশান পুরোপুরি রপ্ত হয়ে গেলে তার পরে বিভিন্ন ধরনের বল দেওয়া শেখা যায়। বেসিক য়্যাকশান যেন বোলিং-এর ম্যাট্রিকুলেশান বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। ভবিষ্যতে ডাক্তার, উকীল, এঞ্জিনীয়র যাই কেন না হওয়ার সাধ থাক, সবার আগে যেমন ঐ পরীক্ষাটা পাশ করতেই হবে, তেমনি সুইং বোলিং বা স্পিন বোলিং যাই কেন না লক্ষ্য হোক, প্রথমে বেসিক য়্যাকশানটা ভালো

অভ্যাস হওয়া চাই। বেসিক য়্যাকশান বলতে বোঝায় চারটি বিষয় :—

১। গ্রিপ (grip) অর্থাৎ বলটাকে কী ভাবে হাতে ধরতে হয়,

২। রান-আপ (run-up) অর্থাৎ বল হাতে নিয়ে পিছন থেকে বোলিং ক্রীজ অবধি দৌড়ে আসা,

৩। ডেলিভারী (delivery) অর্থাৎ হাত থেকে বলটা ছাড়ার কৌশল,

৪। ফলো-থ্রু (follow through) অর্থাৎ হাত থেকে বলটা ছাড়া পাওয়ার পরে হাত-পা ও শরীরের গতি সামলানো।

প্রত্যেকটি বিষয়ই এত দরকারী আর এত নিখুঁত ভাবে শিখতে হয় যে, তাদের সম্পর্কে আলাদা করে' না বললে নয়।

গ্রিপ

কমলালেবু, আপেল, নাশপাতি ইত্যাদি ছোট গোল ধরনের জিনিষ আমরা হাতের মাঝখানে রেখে পাঁচটা আঙ্গুল দিয়ে ঘিরে ধরি। কারণ আঙ্গুলের ডগাগুলি ভিতরের দিকে বাঁকালে হাতের তেলোটা একটা বাটির মতো হয়, তাতে গোল জিনিষটা বেশ লাগসই হয়ে বসে। ক্রিকেট বলকে কিন্তু ওভাবে ধরলে চলবে না। বোলারকে বল ধরতে হয় শুধু আঙ্গুল দিয়ে আলতো ভাবে যাতে বল আর হাতের তেলোর মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁক থাকে।
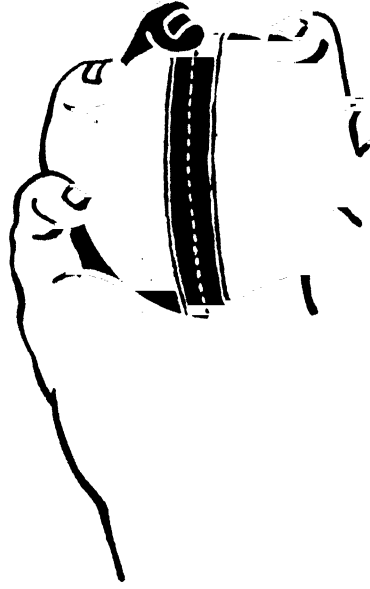
২ নং ছবি
ভুল গ্রিপ। বল দিতে
এভাবে বল ধরতে নেই।

পরের পৃষ্ঠায়, তিন নম্বর ছবিটার মতো। ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গুল বলের সেলাইটার এ-পাশে ও-পাশে রেখে, ডাইনে বাঁয়ে মোচড় দিয়েই বোলার বলকে নানাদিকে বাঁকায়, লাফায় ও ব্যাটসম্যানকে ঠকায়।

ছেলেদের হাত ছোট, তাই গোড়াতে শুধু আঙ্গুল দিয়ে বলটা ধরতে হয়তো একটু অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলেই অসুবিধা দূর হবে।
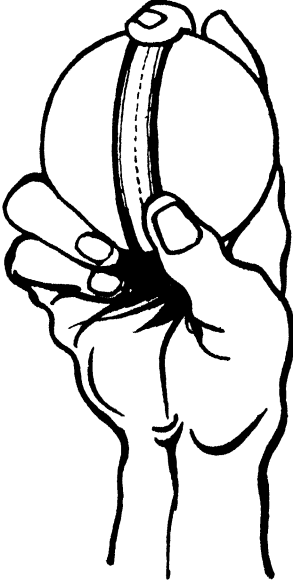
৩ নং ছবি

ঠিক গ্রিপ। বলকে শুধু আঙ্গুল দিয়ে ধরা হয়েছে। বল হাতের তেলো ছোঁয় নি।

একটা কথা আগেই বলে রাখা দরকার। ক্রিকেটে প্রমাণ সাইজ একটা বলের ওজন হলো সাড়ে পাঁচ থেকে পৌনে ছয় আউন্সের মতো। তার পরিধি নয় ইঞ্চির চাইতে সামান্য একটু কম। কিন্তু ব্যাটিং-এর বেলায় যেমন ছোটদের বড় মাপের ব্যাট ব্যবহার করতে নেই, বল দেওয়ার সময়ও তেমনি তাদের প্রমাণ সাইজের বল নিয়ে খেলা উচিত নয়। চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক ছেলেরা পৌনে পাঁচ আউন্সের বেশী ভারি বল নিয়ে কক্ষণও খেলবে না। খেললে শুধু যে ভালো বোলার হতে বিঘ্ন ঘটে তা নয়, তাদের স্বাস্থ্যও খারাপ হয়।

রান-আপ

৪ নং ছবি

রান-আপের গোড়াতে শরীর সামনে ঝুঁকে আছে। বোলারের সমুখের লাইনটা বোলিং ক্রীজ। বাঁ দিকের ছোট লাইনটা রিটার্ন ক্রীজ।

বোলারের দিকটায় স্টাম্পের দু'ধারে চার ফুট করে লম্বা পপিং ক্রীজের মতো দাগ টানা থাকে। তার নাম বোলিং ক্রীজ (bowling crease)। বোলিং ক্রীজের দু'মাথায়, অফে ও অনে, সমকোণভাবে আর দুটো ছোট দাগ থাকে। সে-দাগকে বলে রিটার্ন ক্রীজ (return crease)। এই রিটার্ন ক্রীজ ও বোলিং ক্রীজের ভিতরে পিছনের পা রেখে বোলারকে বল দিতে হয়। স্টাম্প তিনটি সাধারণতঃ থাকে বোলারের ডান দিকে।

ম্যাচ খেলায় দেখা যায়, বল দেওয়ার মুখে বোলার কয়েক পা দৌড়ে এসে বোলিং ক্রীজে পৌঁছুচ্ছে। ফাস্ট বোলার বেশী দূর থেকে জোরে দৌড়ে আসে, আর স্লো-বোলার আস্তে আস্তে এবং অনেক কাছে থেকে। একে বলে রান-আপ (run-up)। রান-আপটা সহজ ও একটানা হওয়া চাই। মাঝপথে থেমে বা একবার লম্বা ও একবার খাটো পা ফেলে না হয়। বেশীর ভাগ বোলারই বাঁ পা এগিয়ে রান আপ সুরু করে।

আমাদের অমরনাথ অবশ্য এ-বিষয়ে অন্য বোলারদের চাইতে আলাদা। তাঁর রান-আপ আরম্ভ হয় ডান পা থেকে।

কয় পা দৌড়ে এলে বল দিতে সব চেয়ে বেশী সুবিধা হয়, প্রত্যেক বোলারকে নিজে পরীক্ষা করে তা বের করতে হবে। কেউ তিন পা দৌড়ে আসে, আবার কেউ বা এগারো পা রান-আপ নিয়ে বল দিতে সুবিধা বোধ করে। আজকাল ইংলণ্ডের সেরা বোলার এলেক বেডসার সাত পা রান-আপ নেন। তবে অধিকাংশ বোলারই বেজোড় পা অর্থাৎ তিন, পাঁচ, সাত, নয় বা এগারো পা দৌড়য়। জি. ও. য়্যালেন ইংলণ্ডের একজন পুরানো টেস্ট বোলার। তাঁর রান-আপ ছিল জোড় সংখ্যক,—বারো পা। বিজোড় বা জোড় যাই হোক, নিজের রান-আপ একবার ঠিক করার পর তার আর নড়চড় করতে নেই। বোলিং ক্রীজে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত রান-আপের সময় শরীরের ব্যালেন্সটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকবে। আগের পৃষ্ঠায় চার নম্বর ছবির মতো। শরীর শক্ত করবে না, মাথা থাকবে একেবারে স্থির। রান-আপ সুরু করার আগেই বোলারকে মনে মনে ঠিক করতে হবে বলটা সে কোনখানে পিচ খাওয়াতে চায়। রান-আপের সময় দৃষ্টি থাকবে সেইখানে।

রান-আপ সুরু করার সময়ে বলশুদ্ধ ডান হাতটা থাকবে সামনে। দু' একজন বোলার অবশ্য ডান হাতটা পিছনে পিঠের দিকে রেখেও রান-আপ আরম্ভ করে। বিলাতের কলিন ব্লীথ ও সি. এস. ম্যারিয়ট ছিলেন এই দলে।

ডেলিভারী

হাত থেকে বলটা ছাড়ার ঠিক আগে, ছাড়ার মুহূর্তে ও ছাড়ার পরে বোলারকে হাত, পা, কাঁধ, কোমর ইত্যাদি নানা রকমে তুলতে, নামাতে, ঘোরাতে ও বাঁকাতে হয়। এগুলি প্রথম থেকেই নির্ভুল ভাবে শেখা চাই। কারণ পরে ভুল শুধরানো খুবই শক্ত হয়।
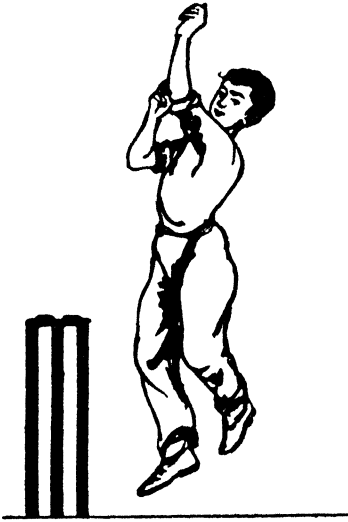
৫ নং ছবি

দু' পা শূন্যে উঠেছে। ডান হাত মুখের কাছাকাছি। বাঁ হাত উঠছে উপরে। বাঁ কাঁধ বাঁকছে ডাইনে। শরীর হেলেছে পিছনে।

রান-আপের শেষে বোলার যখন বোলিং ক্রীজে প্রায় পৌঁছে গিয়েছে, তখন বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে তাকে একটু লাফিয়ে উঠতে হবে। লাফ দেওয়ার আগে থামলে চলবে না, দৌড়ের মাথায় লাফাতে হবে। খুব উঁচু লাফ নয়, সামান্য একটু। ইংরেজীতে যাকে বলে স্প্রিং (spring) তাই,—জাম্প (jump) নয়।

রান-আপে বোলারের বুক আর দু'পায়ের টো অর্থাৎ ডগা
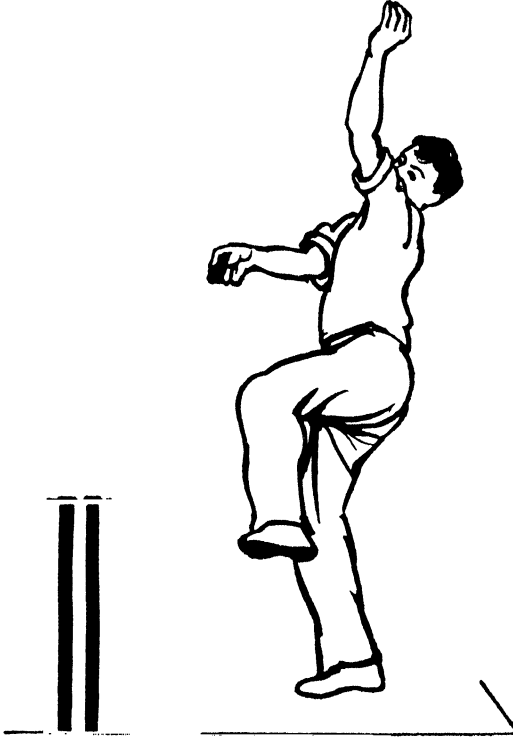
৬ নং ছবি

ডান পা বোলিং ক্রীজের সঙ্গে সমান্তরাল, টো স্টাম্পের দিকে। বাঁ হাত সোজা উপরের দিকে। সে হাতের পাশ দিয়ে দৃষ্টি পিচের দিকে। বুক মিড অন্ মুখো।
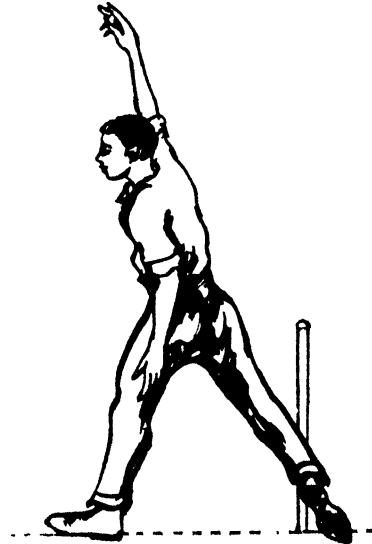
৭ নং ছবি

বলটা ছাড়বার মুহূর্ত। বাঁ পা নেমেছে পপিং ক্রীজের ভিতরে, ডান পা যে লাইনে আছে তার ডাইনে। বাঁ পায়ের টো লং অন্ আউটফিল্ড-মুখো।

ছিল ব্যাটসম্যানের দিকে। রান-আপের শেষে লাফ দেওয়ার ফলে দু' পা-ই যখন শূন্যে উঠে গিয়েছে, তখন শরীরটাকে ডান দিকে বাঁকাতে সুরু করবে। ডান হাত অর্থাৎ যে-হাতে বলটা আছে সেটা মুখের কাছাকাছি তুলবে। বাঁ হাতটা উঠতে থাকবে উপরের দিকে। মাথা ডাইনে বাঁয়ে বা পিছনে বাঁকবে না। দৃষ্টিও নড়বে না। পাঁচ নম্বর ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে নিলে বোঝা সহজ হবে।

শূন্য থেকে পা যখন মাটিতে নেমে আসছে, তখন ঐ ডাইনে বাঁকানো শরীরটাকে একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে রাখতে হয়। তা'হলে ডান পায়ের উপর শরীরের ভর পড়বে এবং সে পা আপনিই আগে মাটি ছোবে। এবার পিঠটাকে কিছুটা ধনুকের মতো বাঁকাও। পা বোলিং ক্রীজের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ক্রীজের পিছনে নামাতে হবে যাতে ডান পায়ের টো থাকে পাশের স্টাম্প-মুখো। শরীরটাকে এবার পুরোপুরি ডাইনে বাঁকাও যেন বাঁ কাঁধটা ফাইন লেগ-মুখো হয়। কোমরের ডান পাশটা থাকবে স্ট্রেট হিট আউট ফিল্ডের দিকে, আর বুক হবে প্রায় মিড-অন-মুখো। বাঁ কাঁধ ফাইন লেগের দিকে থাকলে কোমরের বাঁ পাশটা আপনা থেকেই ব্যাটসম্যান-মুখো হবে। ছয় নম্বর ছবিটিতে যেমন রয়েছে। বাঁ হাতটা মাথা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ উপরে তুলে দাও নৌকোর মাস্তুলের মতো। সে হাতের বাঁ পাশ দিয়ে তাকিয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে পিচের দিকে। ডান হাত এবার মুখের কাছ থেকে নীচের দিকে নামতে নামতে বুকের সামনে এসে পৌঁচেছে। ডান হাতের কব্জিটা এমন ভাবে বেঁকে থাকবে যাতে হাতের তেলো ও আঙুলগুলো পিছনের দিকে হেলে থাকে।

সাত নম্বর ছবিটি হলো এর পরের ধাপ। এবার বাঁ পা নেমেছে পপিং ক্রীজের ভিতরে। পায়ের গোড়ালিটা আগে মাটি ছোঁবে, পায়ের ডগা নয়। ডান পা থেকে বাঁ পা যেন খুব দূরে নামিও না, কারণ দু' পায়ের মাঝখানে অনেক বেশী ফাঁক থাকলে শরীরের ভারসাম্য, ইংরেজীতে যাকে বলে ব্যালেন্স, বজায় রাখা শক্ত হবে। ডান পা যে-লাইনে আছে বাঁ পা থাকবে তার ডাইনে। বাঁ পায়ের টো হবে লং-অন্ আউটফিল্ড-মুখো।

এই বাঁ পা হলো যেন শরীরে খুঁটি। সে-খুঁটিতে ভর দিয়ে বাঁ কাঁধ ও বাঁ কোমর এখন বাঁ দিকে ঘুরতে থাকবে। বাঁ হাত নামবে সামনের দিকে নীচে আর তার সঙ্গে ডান হাত পিছন দিক দিয়ে উঠবে মাথার উপরে। ডান হাতটাকে যত বেশী উঁচুতে তোলা যায় ততই ভালো। এই জন্য বিলাতে ক্রিকেটের মাস্টাররা বলেন, "আকাশ ছুঁতে চেষ্টা কর"। হাত উঁচুতে রেখে বল দিলে বলটা পিচ খেয়ে যত বেশী লাফায় বা যত তাড়াতাড়ি বেঁকে যায়, হাত নীচু থাকলে তত নয়।

এবার হাত থেকে বলটা ছুঁড়তে হবে। বল ছোড়ার মুহূর্তে কব্জির কাছে বাঁকানো হাতটাকে সামনের দিকে জোরে ঠেলে দিতে দিবে, সাপ যেমন করে ছোবল দেয় সেই ভঙ্গিতে। ইংরেজীতে একে বলে "ফ্লিপিং দি রিস্ট"। শরীরের সমস্ত ওজনটা এখন বাঁ পায়ের উপরে চলে গিয়েছে। ডান পায়ের টো শুধু ছুঁয়ে আছে মাটিতে। বলটা হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মুহূর্তে বোলারের বুক ব্যাটসম্যান-মুখো হবে, তার আগে নয়।

ফলো-থ্রু

৮ নং ছবি
ফলো-থ্রুতে ডান কাঁধ হয়েছে ব্যাটসম্যান-মুখো। ডান হাত উরু ঘেঁষে বাঁ হাতের পিছু নিয়েছে।

ব্যাটসম্যান যেমন ড্রাইভ, কাট, পুল, ইত্যাদি মারের পরে ফলো-থ্রু করে, বোলারকেও তেমনি বল দেওয়ার পরে ফলো-থ্রু করতে হয়। হাত থেকে বলটা ছাড়া পাওয়ার পরে শরীরটা অফের দিকে এতখানি ঘুরে যাবে যাতে বোলারের ডান কাঁধ এবার ব্যাটসম্যান-মুখো হয়। বাঁ পায়ের খুঁটির উপর ভর দিয়ে শরীরটা ঝুঁকেছে সামনের দিকে, ডান পা এখন আর মাটি ছুঁয়ে নেই, হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়ে উঠেছে পিছনে। বাঁ হাতটা চলে গিয়েছে সোজা পিছনে আর বাঁ উরু ঘেঁষে ডান হাতটা তার পিছু নিয়েছে। আট নম্বর ছবিটা দেখলে বিষয়টা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। রান-আপের সুরু থেকে ফলো-থ্রু পর্যন্ত মাথা কিন্তু আগাগোড়া স্থির থাকবে, একটুও এদিক ওদিক হেলবে না। চোখের দৃষ্টিও থাকবে সর্বদা পিচের উপর।

ফলো-থ্রু'র শেষটায় বোলারকে কয়েক পা সামনে এগিয়ে

যেতে হয়, নইলে সামনে-ঝোঁকা শরীরটা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে যে। এগোবার সময় বাঁ দিকে অর্থাৎ অফের দিকে যেও, সোজা এগোলে পায়ের দাগে পিচটা নষ্ট হতে পারে, তাতে আম্পায়ার আপত্তি করবেন।

অনেকেই হয়তো ভাববে, এত সব হাঙ্গামার দরকার কী ? বোলিং ক্রীজে ঠায় দাঁড়িয়ে সোজা ডান হাত থেকে বলটা ছাড়লেই তো চলে। না, চলে না। উপরে যতগুলি নির্দেশ বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির পিছনে একটা কারণ আছে।

স্কুলে অনেক সময় তোমরা একে অন্যের সঙ্গে লং জাম্পের পাল্লা দাও। লক্ষ্য করেছ বোধ হয় যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লাফালে মোটেই বেশী দূর পার হওয়া যায় না। কিছুটা পিছন থেকে দৌড়ে এসে না লাফালে তোমার লাফাবার ক্ষমতা সবটা খোলে না। বোলিং এর বেলায়ও ঠিক তাই।

ডেলিভারীর আগে ও পরে হাত, পা ও শরীরের কাজগুলিও অনর্থক নয়। রান-আপের পরে বোলিং ক্রীজে এসে ব্যাটসম্যান-মুখো হয়ে বল দিলে বলে মোটেই ধার থাকে না। তার নাম "ফুল চেস্টেড বোলিং" (full chested bowling)। ফুল চেস্টেড বল দিলে বলে শুধু তোমার হাতের জোরটাই. পড়বে, শরীরের জোরটা নয়। "ডোণ্ট বৌল উইথ ইওর আর্ম, বৌল উইথ ইওর বডি" এই চলতি ইংরেজী কথাটার মানে হলো,—বল দিতে শুধু হাত লাগাবে না, শরীরটাও কাজে লাগাবে।

অবশ্য গোড়াতে ডেলিভারীর সব নির্দেশ মেনে বল দিতে একটু অসুবিধা ঠেকবে। হাত থেকে বলটা ঠিক যে-মুহূর্তে ছাড়া

উচিত, তার এক সেকেণ্ড আগে ছাড়লে বলটা উইকেট-সোজা না গিয়ে অনের দিকে যাবে। আবার দেরী হলে বলটা হয়তো অফে গালীর কাছে পিচ খাবে। কিন্তু কিছুদিন বল দেওয়া অভ্যাস করলেই বোলার দেখবে, বল ছাড়বার ঠিক মুহূর্তটি সে নিজেই বুঝতে পারছে, বলও স্টাম্প ছাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে যাচ্ছে না।

বোলিং-এ সব চেয়ে বেশী দরকার য়্যাকিউরেসি অর্থাৎ ঠিক লেংথ আর ডিরেকশান—সে কথা আগেই বলেছি। সুতরাং সেটা রপ্ত করতে হবে সবার আগে। তার উপায় হলো বল দিতে থাকা, অর্থাৎ প্র্যাকটিস। যে কোনো খোলা জায়গায়, উঠন, পার্ক বা মাঠে বোলিং প্র্যাকটিস করা যেতে পারে। সরঞ্জাম দরকার হবে শুধু একটা বল আর দু'খানা স্টাম্প।

একটি করে স্টাম্প দু'দিকে পুঁতে নাও। স্টাম্প দুটির মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটাই হলো তোমার পিচ। বড়দের ম্যাচ খেলার পিচ লম্বায় বাইশ গজ। কিন্তু ছোট ছেলেদের জন্য ব্যাট, বল, প্যাড, স্টাম্প সবই যেমন ছোট মাপের, তাদের পিচটাও হবে ছোট। সাত থেকে দশ বছরের ছেলেদের পিচ ষোল, সতর গজ হলেই যথেষ্ট। স্টাম্পের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে একটা করে দাগ টেনে নাও। সেটা হলো তোমার বোলিং ক্রীজ। এখন বেসিক য়্যাকশান অনুযায়ী সেখান থেকে বল দিয়ে উল্টো দিকের স্টাম্পে লাগাতে চেষ্টা কর। এই হলো বোলিং প্র্যাকটিসের প্রথম ধাপ।

কিন্তু একা একা এভাবে বেশীক্ষণ বল দিতে ভালো না লাগতে পারে। কাজেই তোমার এমন একজন বন্ধুকে সঙ্গে

নিও যে বোলিং শিখতে চায়। দুজন দু'দিকের উইকেটে দাঁড়াবে। তুমি বল দিয়ে তার স্টাম্প ফেলতে চেষ্টা করবে। সে ঐ বলটাকে কুড়িয়ে আবার তোমার স্টাম্প লক্ষ্য করে বল দেবে। কে কতবার কার স্টাম্পে বল লাগিয়েছে সে অনুযায়ী নম্বর পাবে। তা নিয়ে যদি প্রতিযোগিতা চালাও, তবে মোটেই বিরক্তি লাগবে না, অথচ প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে।

একে অন্যের বল দেওয়ার ভঙ্গির উপর কড়া নজর রাখবে,—দেখবে, বেসিক য়্যাকশানগুলি অর্থাৎ রান-আপ, ডেলিভারী, ফলো-থ্রু শুদ্ধ হচ্ছে কিনা।

শুরুতে যদি অসুবিধা হয়, তবে সতর গজের বদলে পিচটা পনর গজ নেওয়া ভালো। বোলার যখন পনর গজ পিচে প্রত্যেক বলটাই স্টাম্পে লাগাতে পারছে, তখন পিচটা এক গজ করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে সতর গজ করবে।

গোড়াতে বলটা কোথায় পিচ খাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। যেখানেই পিচ খাক না কেন, বলটা স্টাম্পে লাগাতে অর্থাৎ ডিরেকশান নির্ভুল করতে পারলেই হলো।

ডিরেকশান ঠিক হয়ে গেলে পর অভ্যাস করতে হবে লেংথ। পিচের ঠিক কোথায় পড়লে বলটা গুড লেংথ হবে তা ব্যাটসম্যান, পিচের অবস্থা ইত্যাদির উপরে নির্ভর করে, তা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই শিক্ষার্থী বোলারকে রপ্ত করতে হবে যাতে সে বলটাকে ইচ্ছা মতো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পিচ খাওয়াতে পারে। বল দেওয়ার আগে বোলার ব্যাটসম্যানের সামনে একটা জায়গাকে মনে মনে নিশানা করবে। বলটাকে সে যদি ঠিক সেই

নিশানায় পিচ খাওয়াতে পারে তবে বোঝা গেল যে, বোলার লেংথ ঠিক রেখে বল দিতে শিখেছে।

ডিরেকশান রপ্ত হওয়ার পরে দু'দিকের উইকেটেই পপিং ক্রীজের বাইরে, মোটামুটি স্টাম্প থেকে তিন গজ বা সাড়ে তিন গজ দূরে লম্বা দু' ফুট ও চওড়া এক ফুট মাপের একটা চৌকো জায়গা দাগ দিয়ে নাও। ঐ দাগের মধ্যে পিচ খাওয়াতে পারলেই বলকে গুড লেংথ বলা হবে। ঐখানে পিচ খেয়ে বলটা যদি স্টাম্পে লাগে তবে বোলার পাবে পাঁচ নম্বর। আর যদি ঐ দাগের বাইরে পিচ খেয়ে স্টাম্পে লাগে তবে মাত্র দু' নম্বর। এই ভাবে দু'দিক থেকে দুই বন্ধুতে "টেস্ট ম্যাচ" খেলতে পারবে।

চৌকো জায়গাটা খড়িমাটি বা চুন দিয়ে দাগ দিয়ে নিলে বোলিং ক্রীজ থেকে সেটা স্পষ্ট দেখা যাবে, নিশানা ঠিক করা সহজ হবে। যদি সম্ভব হয় তবে এক টুকরো টিন,—যেমন ঘি বা তেলের পুরানো কেনেস্তারার খণ্ড—ঐ দাগের মাপে কেটে বসিয়ে দিও। তাহলে বলটা ওখানে পিচ খেলেই ঠুক্ করে একটা আওয়াজ হবে। কার বল গুড লেংথ হয়েছে বা হয়নি, তা নিয়ে কোনো তর্ক বা ঝগড়া বাধবার সম্ভাবনা থাকবে না।

ফাস্ট বোলিং

কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে প্রত্যেক ছাত্রকেই বেছে নিতে হয় সে আই. এ. পড়বে কি আই. এস. সি. পড়বে। বল দিতে শেখার আগেও প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ঠিক করতে হয় সে ফাস্ট বোলার হবে কি স্লো বোলার হবে। আই. এ. আর আই. এস. সি. যেমন একসঙ্গে পড়া যায় না, তেমনি একই লোক ফাস্ট ও স্লো বোলিং ত্নটোতেই সমান ওস্তাদ হতে পারে না।

ছোট ছেলেরা যখন প্রথম ক্রিকেট খেলতে শুরু করে, তখন তারা সবাই জোরে বল দেয়। ফাস্ট বোলিং-এর মধ্যে তারা একটা বীরত্বের স্বাদ পায়। বলের ঘায়ে উইকেটের মাথা থেকে বেল অনেক দূরে উড়ে যাচ্ছে, স্টাম্প ছিটকে পড়ছে হু' তিন গজ পিছনে, তা দেখতে তাদের খুব খুশি লাগে। স্লো বোলিংকে তারা শক্তি ও তেজের অভাব মনে করে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে। তাই বাড়ির উঠনে, গলির রাস্তায় বা পার্কে ছেলেরা যেখানে ক্রিকেট খেলে সেখানে দেখা যায়, সব বোলারই অনেক লম্বা রান-আপ নিয়ে সমস্ত গায়ের জোরে বল দিচ্ছে। বলের লেংথ ঠিক হোক আর নাই হোক তাতেই তারা উইকেটও পায়। কারণ ব্যাটসম্যান তাদেরই বয়সী ও আনাড়ি। বেশীর ভাগই প্যাড বা গ্লাভস না পরে' ব্যাট করতে নামে। সে বেচারা জোরে

বল আসছে দেখেই ঘাবড়ে যায়। গা, হাত, পা বাঁচাতে উইকেট ছেড়ে শর্ট লেগের দিকে সরে আসে কিম্বা চোখ বুঁজে কোনোমতে বলের দিকে ব্যাট এগিয়ে দেয়। আর অমনি হয় বোল্ড বা কট আউট।

কিন্তু একটু বড় হয়ে ঐ সব ফাস্ট বোলারেরা যখন স্কুলের 'এ' টীমে বা ক্লাবে খেলতে নামে, তখন তারা দেখে তাদের বলে ব্যাটসম্যান আউট তো হচ্ছেই না বরং কষে পিটিয়ে রান তুলছে। কারণ সেখানে ব্যাটসম্যান বল জোরে আসছে দেখলেই মুষড়ে যায় না। তা ছাড়া, ছোট পিচে যারা খুব জোরে বল দিচ্ছিল, বড় মাপের পিচে তারা আর তেমন জোরে বল দিতে পারে না। উঠনের বা ফুটপাথের খেলায় যে সব বোলার কামানের গোলা ছাড়ে বলে নাম করেছে আর ভেবেছে বড় হয়ে এক একজন লিণ্ডওয়াল বা টু্ম্যান হবে, তারা বড় ম্যাচ খেলতে গিয়েই বুঝতে পারে সাধারণ জোরে অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে মিডিয়ম-পেস (Medium-pace) বলের চাইতে বেশী ফাস্ট বল দেওয়া তাদের সাধ্য নয়।

সবাই ফাস্ট বোলার হতে পারে না। ফাস্ট বোলারের পক্ষে প্রথম দরকার উপযুক্ত শরীর। যাদের গড়ন খুব উঁচু, সাধারণতঃ তারাই ভালো ফাস্ট বোলার হয়। স্পোফোর্থ, টম রিচার্ডসন, জ্যাক গ্রেগরী, টেড ম্যাকডোনাল্ড, আলফ গোভার প্রভৃতি নামকরা ফাস্ট বোলারেরা সবাই ছ' ফুটের বেশী লম্বা ছিলেন। ফাস্ট বোলার হিসাবে ভারতবর্ষে সব চেয়ে যার বেশী নাম, সেই মহম্মদ নীসার যথেষ্ট লম্বা ছিলেন।

সুঁটে ব্যানার্জীও বেশ লম্বা। অবশ্য বিলাতের লারউড আর অস্ট্রেলিয়ার লিণ্ডওয়াল খুব লম্বা নয়। তবে তাদের কোনো মতেই বেঁটে বলা চলে না। তারা ছ' ফুটের উপরে লম্বা হলে তাদের বল যে আরও মারাত্মক হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লম্বা লোকের পক্ষে বলটাকে পিচ থেকে অনেকটা উঁচুতে লাফিয়ে তোলা অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে 'লিফট্' তা পাওয়া সহজ। ফাস্ট বোলিং-এ সেটা খুব কাজে লাগে।

ফাস্ট বোলিং-এ শরীরের দৈর্ঘের চাইতেও বেশী দরকার শরীরের শক্তি। জোরে বল দিতে খুব বেশী পরিশ্রম হয়। যাদের শরীর দুর্বল, আর যাদের দম কম, তারা ফাস্ট বোলিং-এর ধকল সইতে পারে না। ফাস্ট বোলিং এর পক্ষে সব চেয়ে বেশী দরকার পিঠের, কাঁধের মাংসপেশীতে ও পায়ে খুব জোর। যে সব ছেলের তা নেই তারা কোনোকালেই ফাস্ট বোলার হতে পারবে না। ফাস্ট বোলিং-এ শরীরের ওজন বলের গতি বাড়ায়। কাজেই রোগা পটকা লোকের চাইতে হৃস্টপুষ্ট শরীর ফাস্ট বোলিং-এর পক্ষে সুবিধাজনক। অবশ্য থল্‌থলে মাংসের পিণ্ড হলে চলবে না; শরীর পেটানো শক্ত হওয়া চাই। ভারতবর্ষে খুব ভাল ফাস্ট বোলার এখন একজনও নেই। কিন্তু যে-কয়জন তবুও পেস বোলার হিসাবে কিছু নাম করেছেন, যেমন ফাদকার, রামচাঁদ, দিভেচা—তাঁরা সবাই মোটামুটি লম্বা এবং তাদের শরীরও বেশ মজবুত। সুতরাং যে-সব ছেলেরা বেঁটে এবং রোগাটে তারা যেন ফাস্ট বোলার হওয়ার চেষ্টা না করে।

শরীরের মতো স্বভাবের সঙ্গেও বোলিং-এর কিছুটা যোগ আছে। যারা খুব সাহসী আর বেপরোয়া ধরনের তারা ফাস্ট বোলিং ভালো করে। যাদের ধৈর্য খুব বেশী, অনেকক্ষণ কোনো একটা বিষয়ে লেগে থাকা যাদের স্বভাব, তারা স্লো বোলিং-এ বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পারে।

বল দেওয়ার মূল কায়দা অর্থাৎ বেসিক য়্যাকশানের কথা আগে বলেছি। ফাস্ট বোলিং-এর বেলায় এই বেসিক য়্যাকশান যেমন নির্ভুল হওয়া দরকার তেমন আর কিছুতেই নয়। রান-আপ, বোলিং ক্রীজে শরীরকে বাঁকানো, ডেলিভারী ও ফলো-থ্রু যদি নিখুঁত না হয়, তবে ভালো ফাস্ট বোলার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এর সব ক'টিই বেশ স্বচ্ছন্দ হওয়া চাই; আড়ষ্ট, এলোমেলো হলে চলবে না।

ফাস্ট বোলিং-এ রান-আপটা লম্বা হওয়া দরকার। শরীরের গতি ডেলিভারীর সঙ্গে মিশে বলের গতি বাড়িয়ে দেয়। ছোট ছেলেরা ফাস্ট বল দিতে গিয়ে অনেক সময় মনে ভাবে, রান-আপটা যত বেশী লম্বা হবে ততই বুঝি বল জোরে যাবে। তাই তারা কুড়ি পঁচিশ পা পিছন থেকে দৌড়ে এসে বল দেয়। আসলে তাতে কিন্তু বল জোরে না হয়ে আস্তে হয়ে যায়। কারণ অতখানি দৌড়ে আসতে আসতেই বোলার ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ডেলিভারীর জন্যে জোর আর অবশিষ্ট থাকে না। ষোল বছরের নীচে যাদের বয়স তাদের রান-আপ দশ বারো পা হলেই যথেষ্ট। হয় তো তার চেয়ে কম রান-আপেও জোরে বল দিতে পারবে। রান-আপের প্রথমে আস্তে শুরু করে গতি বাড়াতে

থাকবে, যাতে বোলিং ক্রীজের কাছে যখন পৌঁছেছ তখন জোরটা সব চেয়ে বেশী হয়। রান-আপ ঠিক না হলে ফাস্ট বোলিং কখনও নিখুঁত হবে না। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট বোলার ম্যাক্‌করমিকের রান-আপ-এ দোষ ছিল, তাই তার সব চেয়ে বেশী নো-বল হতো।

ডেলিভারীতে শরীরের গতি ও ভারটা কাজে লাগানো চাই। অর্থাৎ বলটা ছাড়বার আগে শরীরকে ডান পাশে বাঁকিয়ে বাঁ কাঁধ ফাইন লেগের দিকে রাখতে হবে। তারপরে বলটা ছাড়ার সময় বাঁ পায়ে ভর দিয়ে শরীরকে ঘোরাতে হবে বাঁ দিকে যাতে ডেলিভারীর শেষে ডান কাঁধ ব্যাটসম্যান-মুখো হয়।

ফলো-থ্রু হওয়া চাই স্বচ্ছন্দ। বাঁ হাত, বাঁ পা আর কোমর ঘেঁষে চলে যাবে পিঠের দিকে। ডান হাত তার পিছু নিয়ে বাঁ ঊরুর পাশে গিয়ে থামবে। অফের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে শরীরের ধাক্কা সামলাতে হবে।

পর পর ঠিক একই ধরনের বল দিতে থাকলে ব্যাটসম্যান তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এজন্য প্রত্যেক বোলারকেই বলের কিছুটা রকম ফের করতে হয়। ফাস্ট বোলার যদি মাঝে দু' একটা বল একটু আস্তে ছাড়ে তবে ব্যাটসম্যানকে আউট করা সহজ হবে। অবশ্য বল দেওয়ার ভঙ্গি থেকে ব্যাটসম্যান যেন আগেই সন্দেহ করতে না পারে যে, এবার বল আস্তে আসছে। ফাস্ট বোলার যদি বলটা আঙ্গুল দিয়ে ধরার বদলে হাতের তেলোয় শক্ত করে ধরে ও ডেলিভারীর সময় ডান হাতের পুরো জোরটা বলে না দেয়, তবে রান-আপ আর শরীর বাঁকানো হুবহু ফাস্ট

বোলিং-এর মতো দেখতে হলেও বলটা অনেক আস্তে যাবে। ব্যাটসম্যান বুঝতে না পেরে আগেই ব্যাট চালাবে, আর অমনি ক্যাচ। বোলার যদি ফলো-থ্রুর সঙ্গে সঙ্গেই একটু এগিয়ে যায় তবে ক্যাচটা তারই হাতে এসে পড়বে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেরা ফাস্ট বোলার কনস্টেনটাইন এই কৌশল খাটিয়ে টেস্ট ম্যাচেও অনেক ব্যাটসম্যানকে "কট য়্যাণ্ড বোল্ড" করেছেন।

স্টাম্প থেকে রিটার্ন ক্রীজ পর্যন্ত বোলিং ক্রীজটা লম্বা প্রায় চার ফুট। ঐ জায়গাটুকুর মধ্যে কখনও স্টাম্পের একেবারে গা থেকে কখনও বা রিটার্ন ক্রীজের দিকে সরে' বল দিলে বলের অদল বদল করা যায়। কারণ তাতে বলটা হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে কখনও বেশী কখনও কম কোণাকোণি আর কোনোবার বা একেবারে সোজা লাইনে ব্যাটসম্যানের কাছে পৌঁছয়। ব্যাটসম্যান যখন সবে উইকেটে এসেছে, তখন একটা ইয়র্কার দিয়ে ফাস্ট বোলার অনেক সময় উইকেট পেয়ে যায়।

বড় ম্যাচ খেলায় দেখবে, ফাস্ট বোলারের একটা বল হঠাৎ একেবারে ব্যাটসম্যানের মাথা অবধি লাফিয়ে উঠল। এই বলকে বলে বাউন্সার বা বাম্পার। শক্ত পিচে একটা খুব ফাস্ট বল বেশী শর্ট পিচ হলে সে-বল অনেকটা লাফিয়ে ওঠে। ভীতু ব্যাটসম্যানকে বাম্পার দিয়ে তার একাগ্রতা নষ্ট করে দেওয়া যায়। তা ছাড়া অনেক ব্যাটসম্যান বাম্পার দেখলেই মনে করে সেটা একটা চ্যালেঞ্জ,—তার সাহসের পরীক্ষা। সে অমনি হুক করতে চেষ্টা করে। হুক্ স্ট্রোকে টাইমিং-এর একচুল নড়চড় হয়েছে কি আর অমনি ক্যাচ ওঠে। কাজেই ম্যাচ খেলায় দু' একটা বাম্পার

দিলে উইকেট পাওয়া যায় অর্থাৎ ব্যাটসম্যান আউট হয়। কিন্তু বেশী বাম্পার দিলে আম্পায়ার আপত্তি করবেন, তা ছাড়া বাম্পার যেন কেবলই ব্যাটসম্যানের শরীর লক্ষ্য করে না দেওয়া হয়। তা'হলে সেটা হবে অন্যায় খেলা—আন্‌ফেয়ার প্লে। ক্রিকেটে নিষিদ্ধ।

লেগে বেশী ফিল্ডসম্যান দাঁড় করিয়ে ব্যাটসম্যানের গা তাক করে বাম্পার দেওয়াকে বলে "বডি লাইন বোলিং" (body-line bowling)। এই বডি লাইন বোলিং-এর জন্য বছর কুড়ি আগে ইংলণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় দু'পক্ষে অনেক মন কষাকষি চলে। তখন এম. সি. সি. নতুন নিয়ম করে বডি লাইন বোলিং নাকচ করে দেন। তার ফলে বিলাতের হ্যারল্ড লারুড—যাকে অনেকে পৃথিবীর সেরা ফাস্ট বোলার বলে,—চিরকালের মতো ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দেন।

বাম্পার না দিয়ে লম্বা ফাস্ট বোলারেরা গুড লেংথ বজায় রেখেও পিচ থেকে বলটাকে অনেকখানি লাফিয়ে তুলতে পারে। বলটা এমনভাবে পিচ খাওয়াতে হয় যাতে বলের সেলাইটা মাটিতে লাগে। বিলাতের ফাস্ট বোলার বিল ভৌস এবং কে. ফার্নেস এ কায়দায় বল দিতেন।

ফাস্ট বোলিং অত্যন্ত পরিশ্রমের ব্যাপার। প্র্যাকটিসের সময় বা ম্যাচ খেলায় কখনও একটানা ফাস্ট বোলিং বেশীক্ষণ করতে নেই। তাতে বোলিংও ক্রমশঃ মিইয়ে আসে, স্বাস্থ্যও নষ্ট হয়। অল্প কিছুক্ষণ বোলিং-এর পরেই ফাস্ট বোলার বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবে।

সুইং বোলিং

ডিরেকশান ঠিক হলে শুধু জোরে বল দেওয়ার ফলেই ফাস্ট বোলার উইকেট পায় অর্থাৎ ব্যাটসম্যানকে আউট করে। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই ফাস্ট এবং ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার আরও একটা কৌশল খাটায়। তার নাম সুইং (swing) বা সোয়ার্ভ (swerve)।

বলটা বোলারের হাত থেকে যে লাইন ধরে আসছিল ব্যাটসম্যানের সামনে পিচ খেয়ে সে লাইন থেকে ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়ার নাম সুইং। বলটা যদি পিচ খেয়ে ব্যাটসম্যানের পায়ের দিকে যায় তবে তাকে বলে ইন সুইঙ্গার বা ইন সোয়ার্ভ। আর যদি ব্যাট থেকে বাইরে অর্থাৎ অফের দিকে বেঁকে যায় তবে তাকে বলে আউট সুইঙ্গার বা আউট-সোয়ার্ভ। ছত্রিশ পৃষ্ঠার ন' নম্বর ছবিটা দেখলে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে বিলাতের ফাস্ট বোলার জর্জ হার্স্ট প্রথমে সুইং বোলিং-এর কৌশলটা ভালো ভাবে কাজে লাগাতে শুরু করেন।

সুইং করাতে সব চেয়ে বেশী দরকার হলো নতুন বল। বলের উপরের চক্চকে পালিশটা মজে গেলে বল সুইং করানো শক্ত। এলেক বেডসার একদিন এক গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গ্রামের কয়েকজন ছোট ছেলে এসে তাঁকে ধরলো,

বল কী করে সুইং করাতে হয় দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। বেডসার রাজী হলেন। ছেলেদের মধ্যে একজনকে বললেন ব্যাট করতে। নিজে বল দিতে শুরু করলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে তিনি একটা বলও সুইং করাতে পারলেন না। ছেলেরা তো অবাক। ইংলণ্ডে এখন যিনি সেরা সুইং বোলার, তিনি হার মেনে গেলেন। ছেলেরা যে-বলটা এনেছে, সেটা এতই পুরোনো যে, তাতে পালিশ নেই একরত্তি। সে-বলকে সুইং করানো বেডসারেরও অসাধ্য। পরের দিন অবশ্য বেডসার একটা নতুন বল নিয়ে এসে ছেলেদের সুইং করানো শিখিয়ে দিলেন।
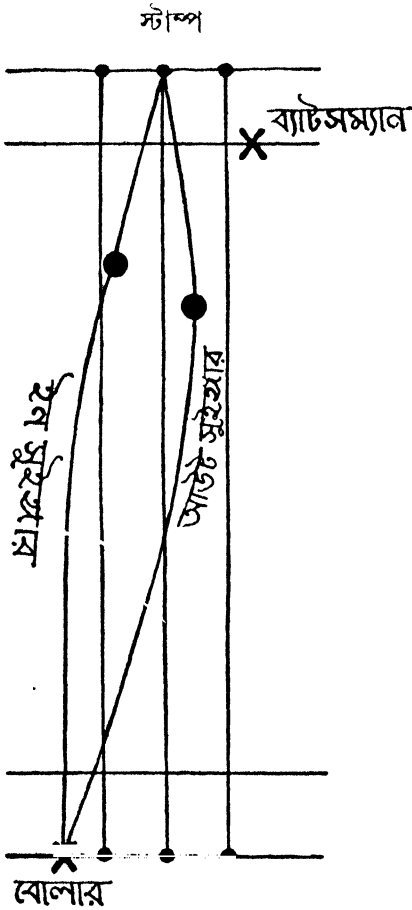
৯ নং ছবি
ইন্ সুইঙ্গার ও আউট সুইঙ্গার বল।

ম্যাচ খেলায় দেখা যায়, ফাস্ট বোলারেরা প্রথমে বল দেয়। তার কারণ এই যে, খেলার শুরুতে বলটা থাকে

নতুন। তার পালিশ,—ইংরেজীতে যাকে বলে শাইন,—চক্ চক্ করে। যতই খেলা চলে, বলের শাইন মজে যায়। লক্ষ্য করেছ বোধ হয়, ফাস্ট বোলারেরা বল দেওয়ার আগে অনেক সময় বলটা তাদের ট্রাউসারসের গায়ে ঘষে নেয়। তাতে বলের পালিশটা বেশীক্ষণ বজায় থাকে। বলের শাইন চলে গেলে সাধারণতঃ ফাস্ট বোলারেরা বল দেয় না, কারণ তখন বল সুইং করানো শক্ত। বলটা শুকনোও থাকা চাই, ভিজে বল সহজে সুইং করে না।

বলের শাইনের পরেই যার উপরে সুইং নির্ভর করে সে হচ্ছে দিনের আবহাওয়া। মেঘলা গুমোট ধরনের আবহাওয়ায় বল যতখানি সুইং করে, পরিষ্কার আকাশ ও শুকনো খরখরে আবহাওয়ায় ততখানি করে না। এইজন্য ইংলণ্ডে বল সুইং করানো যেমন সুবিধা, ভারতবর্ষে তেমন নয়।

মাঠে কোন দিক থেকে বাতাস বইছে এবং কতখানি জোরে বইছে তাতেও সুইং কম বেশী হয়। বাতাসের বিরুদ্ধে বল দিলে বল একভাবে সুইং করবে, আবার বাতাসের সঙ্গে বল দিলে করবে অন্যভাবে। মাঠের চারদিকে গাছ থাকলে বল বেশী সুইং করে। দালান, কোঠা, বাড়িঘর থাকলে সুইং করে কম। বিলাতের চেস্টারফিল্ড, বাথ প্রভৃতি মাঠে বল যতখানি সুইং করে, কেনিংটন ওভালে ততখানি নয়। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে বল সুইং করানো সুবিধাজনক।

বল সুইং করাতে বোলারকেও একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বল দিতে হয়। ইন সুইঙ্গার এবং আউট সুইঙ্গারে সে ভঙ্গিরও আবার অদল বদল হয়।

ইন সুইঙ্গার

যে-বলটা পিচ খেয়ে ব্যাটের সমুখ থেকে অফের দিকে চলে যায় ব্যাটসম্যানের পক্ষে সেটাই বেশী মারাত্মক। সুতরাং আউট সুইঙ্গার দিয়েই ব্যাটসম্যানকে বেশী বিপদে ফেলা যায়। কিন্তু আজকাল অনেক ফাস্ট ও ফাস্ট-মিডিয়ম বোলারই ইন সুইঙ্গার বল দেয়। তার একটা কারণ এই যে, নতুন নিয়মে আউট সুইঙ্গার দিয়ে ব্যাটসম্যানকে এল. বি. ডব্লিউ করার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া যে-সব ব্যাটসম্যান অফ স্টাম্পের সামান্য একটু বাইরের বল ছেড়ে দেয়, তাদের ইন সুইঙ্গার দিয়ে আউট করা সহজ।

ইন সুইঙ্গারে বলটাকে ধরতে হবে এমনভাবে যাতে বলের সেলাইটা হাতের প্রথম আঙ্গুল, অর্থাৎ যাকে বলে তর্জনী, আর মাঝের আঙ্গুল এ দু'এর মাঝখানে থাকে। বুড়ো আঙ্গুলটা থাকবে ঠিক ঐ দুই আঙ্গুলের নীচে। মাঝের আঙ্গুলটা প্রায় সেলাই-এর উপরে থাকবে। কেউ কেউ মাঝের আঙ্গুলটা সেলাই-এর ঠিক উপরে রেখে তার পাশেই রাখে তর্জনী। সেলাইটা ফাইন লেগের দিকে নিশানা হবে। ঊনচল্লিশ পৃষ্ঠায় ইন সুইঙ্গার গ্রিপ এঁকে দেখানো হয়েছে। বলটা যেন আঙ্গুল দিয়ে খুব শক্ত করে চেপে না ধরা হয়। মোটামুটি এই ধরনটা বজায় রেখেও বোলিং-এর সময় কোনো বোলার আঙ্গুলগুলিকে একটু বেশী কাছে বা বেশী দূরে রেখে বল ভালো সুইং করায়। কাজেই রান-আপের

মতো গ্রিপের বেলায়ও প্রত্যেক বোলারকেই নানাভাবে পরীক্ষা করে ঠিক করতে হবে কী ভাবে বল ধরে' অর্থাৎ কোন ধরনের গ্রিপে সে সব চেয়ে ভালো ফল পায়।

ইন সুইঙ্গার দেওয়ার কালে ডেলিভারী য়্যাকশানে বোলারের বাঁ পা ডান পায়ের লাইন ছাড়িয়ে অনের দিকে না নিয়ে রাখতে হবে সামান্য একটু বাঁয়ে অর্থাৎ অফের দিকে। ডান হাতকে কান ঘেঁষে যতটা সম্ভব উঁচুতে তুলতে হবে। ফলো-থ্রু'তে সে হাতটা বাঁ উরুর দিকে না গিয়ে ডান উরুর পাশ দিয়ে পিছনে যাবে। যদিও ফুল চেস্টেড বল দিলে বলে ধার থাকে না আগে বলা হয়েছে, ইন সুইঙ্গারের বেলায় কিন্তু কিছুটা ফুল চেস্টেড বল দিতে হয়। রিটার্ন ক্রীজ ঘেঁষে বল দিলে বল আপনিই অনেকটা ইন সোয়ার্ড হয়। কিন্তু সে-বল ব্যাটস-ম্যানের পক্ষে ঠেকানো সহজ। উইকেটের গা ঘেঁষে নির্ভুল ডেলিভারী য়্যাকশানে বল দিলে বলটা অনেক দেরীতে সুইং করবে এবং সেটাই হলো ব্যাটসম্যানের পক্ষে মারাত্মক। ইন সুইঙ্গার বল অফ স্টাম্প
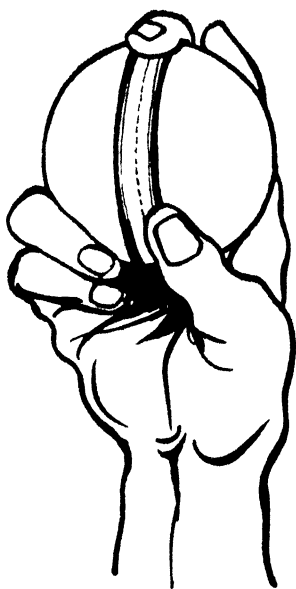
১০ নং ছবি।
ইন সুইঙ্গারের গ্রিপ।
বলের সেলাইটা ফাইন লেগের দিকে নিশানা।

নিশানা করা ভালো। বল বেশী সুইং করলে অফ স্টাম্পের একটু বাইরে তাক করতে হয়। বলটাকে এমন ভাবে পিচ খাওয়ানো দরকার যাতে ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড খেলতে বাধ্য হয়। অনেক ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড খেলতে গিয়ে বাঁ পা আর ব্যাটের মাঝখানে ফাঁক রেখে দেয়। ইন সুইঙ্গার সেখান দিয়ে গলে উইকেটে গিয়ে লাগে।

ফাস্ট বোলারকে ডিরেকশান সব সময়েই ঠিক রাখতে হবে। যাতে ব্যাটসম্যান কোনো বলই ছেড়ে না দিতে পারে। প্রত্যেকটি বলই যেন সে খেলতে বাধ্য হয়। ইন সুইঙ্গারের বেলায়ও তাই। বলের শাইন অর্থাৎ পালিশ বেশীক্ষণ থাকে না। আর পালিশ উঠে গেলে সুইং বোলিং মারাত্মক হয় না। কাজেই যে-সময়টুকু বলের পালিশ থাকে সে-টুকু স্টাম্প ছাড়িয়ে বল দিয়ে নষ্ট করা নিছক বোকামি। কারণ স্টাম্পে লাগবার আশঙ্কা না থাকলে ব্যাটসম্যান বলগুলি নির্ভয়ে ছেড়ে দেবে।

ব্যাটসম্যানকে আউট করার জন্যে বোলার ফিল্ডারদের উপরে অনেক নির্ভর করে। ফাস্ট বোলিং-এ ফিল্ড সাজাবার ধরন পরে দেখানো হয়েছে। একটু অদল বদল করে তা'কে কী ভাবে ইন সুইঙ্গারেও কাজে লাগানো যায় তা'ও বলে দেওয়া হয়েছে।

কোনো কোনো ইন সুইঙ্গার বোলার হঠাৎ একটা বিশেষ ধরনের বল দিয়ে ব্যাটসম্যানকে আউট করে যার নাম "লেগ কাটার"। সাধারণতঃ মিডিয়ম বা ফাস্ট-মিডিয়ম বোলারেরাই লেগ কাটার দেয়। সে-বল সম্পর্কে পরে আলাদা করে বলবো।

আউট সুইঙ্গার

আউট সুইঙ্গার বল দেওয়া ইন সুইঙ্গারের চাইতে কঠিন। কিন্তু ব্যাটসম্যানের কাছে আউট সুইঙ্গার বেশী ভয়ের বস্তু। আউট সুইঙ্গার যত দেরীতে বাঁকতে শুরু করে ততই বেশী বিপদ ঘটায়।

১১ নং ছবি।
আউট সুইঙ্গারের গ্রিপ।
সেলাইটা ফার্স্ট শ্লিপের দিকে হেলে আছে।

আউট সুইঙ্গার দিতেও তর্জনী এবং মধ্যমা অর্থাৎ মাঝের আঙ্গুল বলের উপরে আর বুড়ো আঙ্গুলটা নীচে রাখতে হবে। তবে তর্জনী ও মধ্যমা এবার সেলাই-এর দু'পাশে থাকবে, আর বুড়ো আঙ্গুলটা থাকবে একেবারে সেলাইটার নীচে। সেলাইটাকে এখন ফাস্ট শ্লিপের দিকে নিশানা করতে হবে। পাশের ছবি দেখলে আশা করি গ্রিপটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

ডেলিভারী য়্যাকশান হওয়া চাই একেবারে নিখুঁত, ঠিক যেমনটি কুড়ি পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে। একটুও যেন ফুল চেস্টেড ডেলিভারী না হয়। ডান হাতটা একটু কম উঁচুতে

তুলে ছাড়লে বলটাকে আউট-সোয়ার্ভ করানো সহজ। কিন্তু সে রকম ডেলিভারীতে বলটা হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্রই বাঁকতে শুরু করবে, তাতে ব্যাটসম্যান বলের লাইনটা সহজে ধরতে পারবে। খুব দেরীতে সোয়ার্ভ করাতে হাত উঁচু রেখে বল দিতে হয়। সেটা গোড়াতে কঠিন হলেও অভ্যাস করা প্রয়োজন। আউট-সোয়ার্ভ স্টাম্পের একেবারে গা ঘেঁষে বল দেওয়া ভালো, যদিও রকমারির জন্য মাঝে মাঝে একটু রিটার্ন ক্রীজের দিকে সরে বল দিলে ক্ষতি নেই।

আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, বলের ডিরেকশান ঠিক হওয়া চাই। আউট সুইঙ্গার লেগ স্টাম্প বা মিডল স্টাম্পের উপরে তাক করতে হয়। অফ স্টাম্প নিশানা করলে বল সুইং করে বাইরে চলে যাবে, ব্যাটসম্যান চৌকশ হলে সে বল ছেড়ে দেবে। ইন সুইঙ্গারের মতো আউট-সোয়ার্ভও একটু সামান্য ওভার পিচড হওয়া ভালো।

আউট সুইঙ্গার বল দিলে ফিল্ড কেমন হবে অর্থাৎ মাঠের কোন কোন জায়গায় ফিল্ডার রাখতে হবে তা' পরে যেখানে ফিল্ড সাজানোর বিষয় বলেছি সেখানে ছবি এঁকে দেখানো হয়েছে।

পাকা সুইং বোলার দু'দিকেই বল সোয়ার্ভ অর্থাৎ বাঁকাতে পারে। তাদের মস্ত সুবিধা এই যে, আউট সুইঙ্গার দিতে দিতে মাঝখানে একটা ইন সুইঙ্গার দিয়ে তারা ব্যাটসম্যানকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলতে পারে। ফলে একটি উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা।

স্লো বোলিং

যাদের যথেষ্ট ধৈর্য নেই, তারা কোনো কালেই ওস্তাদ স্লো বোলার হতে পারবে না। কারণ স্লো বোলিং-এ পাকা হতে অনেক বছর ধরে' অভ্যাস করতে হয়। তা' ছাড়া স্লো বল অনেক সময় ব্যাটসম্যানরা কষে পিটিয়ে রান তুলতে থাকে। তাতে যারা হাল ছেড়ে দেয়, তাদের পক্ষে স্লো বোলার হওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। একটা কিছু ধরলে হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও যারা তা' আঁকড়ে থাকতে পারে তারাই স্লো বোলিং-এ উন্নতি করতে পারে। স্লো বোলারের হাতের আঙুলগুলিও বেশ লম্বা এবং জোরালো হওয়া চাই।

কেউ কেউ বলেন, যারা একবার ফাস্ট বোলিং-এ অভ্যস্ত হয়েছে, তারা আর স্লো বোলিং শিখতে পারে না। সে-কথা সত্যি নয়। বিলাতের কয়েকজন খুব নামকরা স্লো বোলার—যেমন উইলফ্রেড রোডস, হেডলী ভেরিটী, টি. এ. গডার্ড—প্রথমে ফাস্ট বোলার হিসাবেই ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছিলেন। তবে এ-কথা সত্য যে, মাঝপথে বদল করার চাইতে, কী ধরনের বল খেলোয়াড়ের শরীর ও স্বভাবের দিক দিয়ে উপযোগী তা' বুঝে নিয়ে বরাবর তাতেই লেগে থাকা ভালো।

স্লো বোলারের প্রধান কৌশল হলো স্পিন (spin)। স্পিন কথাটার বাংলা মানে,—লাটিমের মতো ঘুরপাক খাওয়া।

বোলার ডেলিভারীর সময় হাতের আঙ্গুল মোচড় দিয়ে ও হাতের কব্জি ঘুরিয়ে বলটাকে এমন ভাবে ছাড়ে যাতে সেটা সোজা ঢিলের মতো না এসে শূন্যে লাটিমের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে এসে ব্যাটসম্যানের সামনে পিচ খায়। স্পিনের ফলে বলটা পিচ খেয়েই একেবারে শাঁ করে এদিকে ওদিকে বেঁকে যায়। স্পিন বোলিং-এ এই বেঁকে যাওয়াকে বলে ব্রেক। শ্লিপের দিকে বাঁকলে তার নাম হয়,—লেগ ব্রেক, আর শর্ট বা ফাইন লেগের দিকে বাঁকলে তাকে বলে অফ ব্রেক। অর্থাৎ ফাস্ট বোলিং-এর ইন সুইঙ্গার আর স্লো বোলিং-এর অফ ব্রেক একই দিকে বেঁকে যায়। তেমনি আউট সুইঙ্গার আর লেগ ব্রেক বাঁকে অন্য দিকে। এদের বাঁকবার ধরনটা কিন্তু এক নয়। সুইং-এ বল বাঁকে ধনুকের মতো, আর ব্রেকের বেলায় সে বেঁকে যায় কোণাকুণি। পাশের ছবির সঙ্গে ছত্রিশ পৃষ্ঠার ছবিটা মিলিয়ে দেখলে তফাৎটা বোঝা যাবে।

১২ নং ছবি।
অফ ব্রেক ও লেগ ব্রেক বল

সুইং বোলিং যেমন নির্ভর করে দিনের আবহাওয়া আর বাতাসের উপরে, স্পিন বোলিং তেমনি
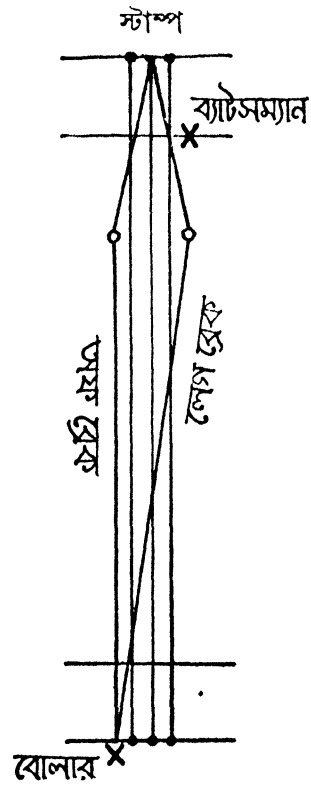
নির্ভর করে পিচের অবস্থার উপরে। কোনো পিচ আছে যাতে বলটা খুব স্পিন খায়, আবার কোনো পিচ আছে যাতে খুব দক্ষ স্পিন বোলারও বলটাকে বেশী বাঁকাতে পারে না। সাধারণতঃ পিচে ধুলো জমলে বা পিচের মাটিটা আল্‌গা হয়ে এলে, ইংরেজীতে যাকে বলে ক্রাম্বলিং পিচ,—তাতেই বল বেশী স্পিন করে। সুইং বলের বেলায় বলের পালিশ যত বেশী বজায় থাকে ততই ভালো। স্পিন বোলিং-এ ঠিক তার উল্টো। কারণ স্পিন বোলিং-এ বলটা আঙ্গুল দিয়ে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে হয়। পালিশ থাকলে আঙ্গুল পিছলে যায়। স্পিন বোলারদের কেন যে ইনিংসের শুরুতে বল দিতে দেওয়া হয় না, তা বোধ হয় এবার বুঝতে পেরেছো। ফাস্ট বোলারেরা প্রথমে বল দিয়ে যে শুধু বলটার পালিশ তুলে দেয় তা নয়, পিচেরও মাটি অনেকটা আল্‌গা করতে সাহায্য করে। তখন আসে স্পিন বোলারদের কৃতিত্ব দেখাবার উপযুক্ত সময়।

স্লো বোলার বেঁটে হলে ক্ষতি নেই। ভারতবর্ষের এখনকার সবচেয়ে ওস্তাদ স্লো বোলার মানকাদ ও গুপ্তে দুজনই বেঁটে। অবশ্য লম্বা হলে স্লো বোলারের আরও বেশী সুবিধা। কারণ যে-বোলার যত লম্বা সে তত বলটাকে পিচ থেকে লিফট্ করাতে অর্থাৎ লাফিয়ে তুলতে পারে। বিলাতের নামকরা স্পিন বোলার হেডলী ভেরিটী লম্বা ছিলেন এবং বলে শুধু বেশী লিফটের জন্যই অনেক উইকেট পেতেন।

অফ ব্রেক

দু' রকম ব্রেকের মধ্যে অফ ব্রেক বল দেওয়াটাই সহজ। আজকাল লেগ ট্র্যাপ অর্থাৎ লেগের দিকে বেশী ফিল্ডার রাখার রীতি চলতি হওয়াতে অফ ব্রেক বোলারদের কদরও বেড়েছে।

১৩ নং ছবি।
অফ ব্রেকেব গ্রিপ।

অফ ব্রেকে বলটাকে তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হয় যাতে সেটা অনামিকার অর্থাৎ কড়ে আঙ্গুলের আগের আঙ্গুলটির গায়ে ঠেস দিয়ে বসে। তর্জনী বলের সেলাই-এর গায়ে থাকবে। আঙ্গুলের ডগাটা একটু সামান্য বেঁকে থাকবে। তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে যেন কিছুটা ফাঁক থাকে। বুড়ো আঙ্গুলটা শুধু বল আলগোছে ছুঁয়ে থাকবে।

স্লো বোলিং এ রান-আপ লম্বা হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু ডেলিভারীর সময় অফ ব্রেকে ডান হাত যথেষ্ট উঁচুতে তুলতে হবে। অফ ব্রেক বল দিতে ডেলিভারীর সময় বলটাকে ডান দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়। তালা খুলতে চাবিকে আমরা যেদিকে ঘুরাই হাতের কব্জি সেদিকে মোচড় দিতে হবে। কব্জিকে সেভাবে মোচড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তর্জনী বলের সীম অর্থাৎ

সেলাইটাকে নীচের দিকে ঠেলে দেবে, মাঝের আঙ্গুলও সেদিকেই জোর দেবে। অফ-স্পিনারের তর্জনীই সব চেয়ে বেশী কাজ করে। এজন্যেই দেখা যায়, বেশীর ভাগ অফ-স্পিনারের তর্জনীতে কড়া পড়ে গেছে। হাতের কব্জি ও আঙ্গুল এতখানি ডাইনে মোচড় দেওয়া চাই যাতে বলটা যখন হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে তখন হাতের তেলো থাকবে উপরের দিকে আর বুড়ো আঙ্গুলের ডগাটা থাকবে প্রায় মাটির দিকে পিচ বরাবর।

স্লো বোলারদের য়্যাকিউরেসী অর্থাৎ লেংথ ও ডিরেকশান বজায় রাখা হচ্ছে সব চেয়ে বেশী দরকার। বিশেষ করে ফাস্ট বোলিং-এ যেমন ডিরেকশান, স্লো বোলিং-এ তেমনি লেংথ বেশী দরকারী। কারণ লেংথ ঠিক না হলে স্লো বোলিং এ ব্যাটসম্যান দমাদম পিটিয়ে রান তুলবে। তা ছাড়া অফে ও লেগে যে-সব ফিল্ডার ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি দাঁড়ায়, লেংথ কম বেশী হলে তাদের জখম হওয়ারও আশঙ্কা।

স্পিন বোলিং-এ বলটা কতখানি বেঁকে যাচ্ছে তার চাইতে কত আচমকা বেঁকে যাচ্ছে সেটাই হলো বেশী দরকারী। যে-বল খুব ধীরে ধীরে এক ফুট বেঁকে যাচ্ছে তা' ব্যাটসম্যানকে তত বিপদে ফেলবে না যত ফেলবে একটা শাঁ করে চার ইঞ্চি বেঁকে যাওয়া বল। মাঠ ভিজে থাকলে বল অনেক সময়ই বেশী স্পিন নেয়, কিন্তু সে-স্পিন হয় বড়ই ধীরে। কাজেই শুকনো অথচ নরম পিচেই স্পিন বোলিং বেশী কাজে লাগে। বাতাসের বিরুদ্ধে বল দিয়ে স্পিন বোলিং-এ বেশী ফল পাওয়া যায়।

অফ-স্পিন বলটা নিশানা করতে হয় অফ স্টাম্পের

সামান্য একটু বাইরে। স্পিন কম নিলে, ঠিক অফ স্টাম্পের উপর।

কোনো কোনো পিচ এমন যে, তাতে বল মোটেই স্পিন নেয় না। এ বিষয়ে অফ ব্রেক বোলারের অসুবিধাটাই সব চেয়ে বেশী। কারণ দেখা গিয়েছে, যে-সব পিচে লেগ ব্রেক বল কিছু স্পিন নিচ্ছে, সে সব পিচে অফ ব্রেক বোলার বলে একটুও স্পিন দিতে পারছে না। সুতরাং স্লো বোলার—তা' সে অফ ব্রেকই দিক, আর লেগ ব্রেকই দিক—শুধু মাত্র স্পিনের ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। তা'কে আরও কতকগুলি কৌশল শিখতে হয়।

বোলারের কৌশল মানেই হলো ব্যাটসম্যানকে ধোঁকা দেওয়া যাতে সে বলের ধরনটা ঠিক ধরতে না পারে, কিম্বা বুঝতে ভুল করে। তা'র দুটো উপায় আছে। প্রথম বলের ফ্লাইট বদল করে, দ্বিতীয় বলের পেস অর্থাৎ গতি কম বেশী করে।
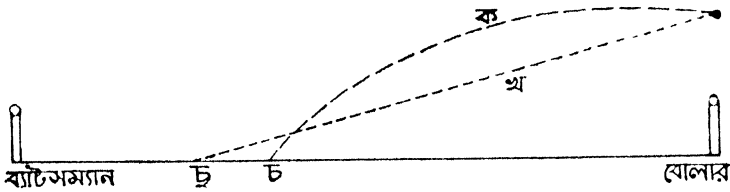
১৪ নং ছবি।

'ফ্লাইট' বদল। বল বেশী উপর দিয়ে অথচ একটু আস্তে ছুঁড়লে ব্যাটসম্যানের সামনে 'চ' লেখা জায়গায় পিচ খাবে। অথচ একই রান-আপ ও ডেলিভারীর ভঙ্গিতে একটু নীচু করে কিন্তু বেশী জোরে ছুঁড়লে পিচ খাবে ব্যাটসম্যানের অনেক কাছে 'ছ' লেখা জায়গায়।

ফ্লাইট (flight) বলতে বোঝায় বলটা বোলারের হাত থেকে

ছাড়া পেয়ে মাটি থেকে কতখানি উঁচু দিয়ে এসে পিচ খাচ্ছে। নীচের ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে যে, বোলার বলটাকে একবার বেশী উঁচু অন্যবার কম উঁচু দিয়ে ছুঁড়েও গতি বাড়িয়ে কমিয়ে ঠিক একই জায়গায় পিচ খাওয়াতে পারে। যে-বলটা বেশী উঁচু দিয়ে আসছে সে-বলটা পিচ খেয়ে অনেক আস্তে ব্যাটসম্যানের সামনে আসবে। যে-বলটা নীচু হয়ে এসে পিচ খাচ্ছে সে-বলটা
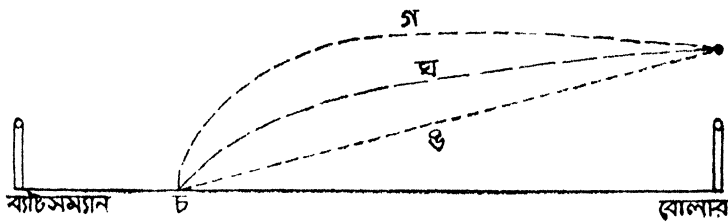
১৫ নং ছবি।

তিনটে বল একই জায়গায় পিচ খাচ্ছে। কিন্তু ফ্লাইট আলাদা হওয়ায় 'ঙ' ফ্লাইটে বলটা যত তাড়াতাড়ি আসবে 'ঘ' ফ্লাইটে ততটা নয়। 'গ' ফ্লাইটে আসবে আরও বেশী পরে।

অনেক তাড়াতাড়ি ব্যাটের সামনে আসবে। ব্যাটসম্যান ফ্লাইটের এই তফাৎটা ধরতে না পারলে হয় আগে ব্যাট চালিয়ে ক্যাচ তুলে আউট হবে, নয়তো দেরীতে ব্যাট চালাতে গিয়ে এল. বি. ডব্লিউ। অবশ্য ফ্লাইটের এই রকমফের রপ্ত করতে বোলারকে অনেক দিন প্র্যাকটিস করতে হবে। হঠাৎ বলের গতি বাড়িয়ে দিয়েও স্লো বোলার ব্যাটসম্যানকে বিপদে ফেলতে পারে।

বলের ফ্লাইট ও গতি বদল না করেও ব্যাটসম্যানকে ঠকাবার একটা উপায় হলো মাঝে মাঝে বোলিং ক্রীজের কিছুটা দূর

থেকে বল দেওয়া। বোলিং ক্রীজ থেকে উল্টো দিকের উইকেটের দূরত্ব হলো বাইশ গজ। বোলার যদি তেইশ গজ দূর থেকে একবার বল দেয়, তবে গতি ও ফ্লাইট আগের বলগুলির সঙ্গে হুবহু এক হলেও তা' একটু দেরীতে ব্যাটসম্যানের সামনে এসে পিচ খাবে। ব্যাটসম্যান আগে ব্যাট চালিয়ে আউট হবে। বিলাতের রয় ট্যাটারসেল অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলায় তার প্রথম উইকেট পেয়েছিলেন এই ফন্দি খাটিয়ে।

১৬ নং ছবি।
১ নং বোলার অফ ব্রেক দিচ্ছে ওভার দি উইকেট। ২ নং বোলার দিচ্ছে রাউণ্ড দি উইকেট। দুটো বল একই জায়গায় পিচ খাচ্ছে। কিন্তু স্পিন খেয়ে ১ নং বোলারের বল লেগ স্টাম্প ছাড়িয়ে যাবে। ২ নং বোলারের বল লাগবে মিডল বা লেগ স্টাম্পে।
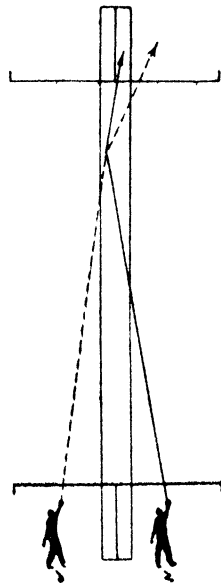
ডান হাতের বোলিং-এ স্টাম্প ডাইনে রেখে বল দেওয়ার নাম ওভার দি উইকেট (over the wicket) বোলিং। স্টাম্প বাঁয়ে রেখে ডান হাতে বল দিলে তাকে বলে রাউণ্ড দি উইকেট (round the wicket) বোলিং। বাঁ-হাতি অর্থাৎ নেটা বোলারের বেলায় অবশ্য স্বাভাবিক ওভার দি উইকেট বোলিংই হয়ে দাঁড়ায় রাউণ্ড দি উইকেট।

ডান-হাতি বোলার সাধারণতঃ ওভার দি উইকেট বোলিং করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় ডান-হাতি অফ স্পিনার রাউণ্ড দি উইকেট বল দিয়ে থাকে। রাউণ্ড দি উইকেট বল দেওয়ার সুবিধা এই যে, তাতে ফ্লাইটের লাইনটা অনেক বেশী কোণাকোণি হয়। পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। পিচ যখন ভিজে থাকে তখন বল অনেক বেশী স্পিন খেয়ে বাঁকে। তখন ওভার দি উইকেট অফ ব্রেক বল দিলে প্রায়ই বল স্পিন খেয়ে লেগ স্টাম্পও ছাড়িয়ে চলে যায়। তখন শর্ট লেগে বেশী ফিল্ডার রেখে রাউণ্ড দিয়ে উইকেট বল দিলে অফ স্পিনার প্রায়ই ক্যাচ অথবা এল. বি. ডব্লিউ পায়। গোড়াতে রাউণ্ড দি উইকেট বল দিয়ে লেংথ ও ডিরেকশান বজায় রাখা একটু শক্ত ঠেকতে পারে। কিন্তু কিছু দিন অভ্যাস করলেই তা' সহজে হয়ে আসবে।

অফ স্পিন বোলার টীমের পক্ষে খুব দরকারী। কারণ সে অনেকক্ষণ বল দিয়েও ক্লান্ত হয় না। কাজেই সে বেশীর ভাগ বোলিং-এর ভার নিতে পারে। এসব বোলারকে ইংরেজীতে বলে স্টক (stock) বোলার। কিন্তু স্টক বোলার যে হবে, সে উইকেট যদি বা না পায় অন্ততঃ রান তোলাটা বন্ধ রাখবে। সেজন্যে সব চেয়ে আগে চাই য়্যাকিউরেসী। যে কেউ ভালো স্পিন বৌলার হতে চায়, তাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, তার ডিরেকশান আর লেংথ, বিশেষতঃ লেংথ নিখুঁত না হলে সে কিছুই করতে পারবে না।

লেগ ব্রেক

আগেই বলেছি যে, যে-বল পিচ খেয়ে ব্যাটের কাছ থেকে বাইরে অর্থাৎ অফের দিকে চলে যায়, ব্যাটসম্যানের পক্ষে সে-বল পিটানো বেশী অসুবিধাজনক। সুতরাং অফ ব্রেকের চাইতে লেগ ব্রেক বেশী মারাত্মক। লেগ ব্রেক বল নিশানা করতে হয় সাধারণতঃ অফ বা মিডল

১৭ নং ছবি।
লেগ ব্রেক গ্রিপ। বোলারের পিছন থেকে যেমন দেখায়।

স্টাম্পের উপর। অফ স্টাম্পের বাইরে লেগ ব্রেক বল দিলে বুদ্ধিমান ব্যাটসম্যান তা' ছেড়ে দেবে।

লেগ ব্রেক বল দিতে বলটা এমনভাবে ধরতে হবে যাতে বলের সেলাই তর্জনী ও মধ্যমাকে আড়াআড়িভাবে কেটে যায়। অনামিকা থাকবে সেলাই-এর গায়ে। লেগ স্পিন দিতে এই অনামিকা দিয়েই বলটাকে ঘুরিয়ে দিতে হয়।
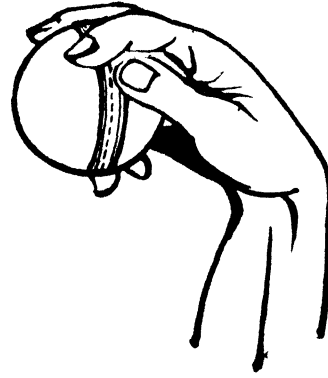
১৮ নং ছবি।
লেগ ব্রেক গ্রিপ। ব্যাটসম্যান যেমন দেখছে।

অর্থাৎ অফ স্পিনে যেমন তর্জনী, লেগ স্পিনে তেমনি অনামিকাই বেশী কাজ করে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হাতের কব্জিও ঘোরাতে হয়। বাহান্ন পৃষ্ঠায় ছবি দুটিতে লেগ স্পিনের গ্রিপ এঁকে দেখানো হয়েছে।

লেগ ব্রেক বল দিতেও ডান হাত খুব উঁচুতে তোলাই ভালো। তবে কেউ যদি হাত কিছুটা নীচু রেখেই বলে বেশী লেগ স্পিন দিতে পারে, তবে সে যেন সেভাবেই বল দেয়। অনেক নামকরা লেগ স্পিনার, যেমন অস্ট্রেলিয়ার ক্ল্যারী গ্রিমেট, একটু নীচু হাতেই বল দিতেন। বাতাসের বিরুদ্ধে, বল দিয়ে লেগ স্পিনার বেশী ভালো ফল পায়।

লেগ স্পিনের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত হলো ধূলো জমা বা আল্‌গা হয়ে যাওয়া পিচ।

লেগ ব্রেক বোলারকে প্রায় সর্বদাই ওভার দি উইকেট বল দিতে হয়। কারণ রাউণ্ড দি উইকেট বল দিলে যে বল স্টাম্প লক্ষ্য করে পিচ খায়, সেটা স্পিনের পরে অফ স্টাম্প ছাড়িয়ে যাবে, আর লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ খাওয়ালে এল. বি. পাওয়ার জো থাকবে না।

লেগ ব্রেক ডেলিভারীর আগে হাতের কব্জিটা নীচের দিকে বেঁকে থাকবে। হাত যখন উপরে উঠেছে তখন হাতের তেলোটা থাকবে প্রায় ফাইন লেগের দিকে। বলটা ছাড়বার সময় অনামিকা ব্যাটসম্যানের দিকে বলটাকে মোচড় দেবে, বুড়ো আঙ্গুলটা নীচের দিকে গড়িয়ে চলে যাবে ব্যাটসম্যান থেকে দূরে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কব্জিও সামনের

দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে ফলো-থ্রু'তে ডান হাতের আঙ্গুল-গুলি ব্যাটসম্যানের উইকেট-মুখো মেলে থাকে। মোটামুটি বলা যায়, লেগ স্পিন দিতে আঙ্গুল ও হাতের কব্জি ঘোরাতে হয় অফ স্পিনের উল্টো দিকে। ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, লেগ স্পিনে আঙ্গুল আর কব্জি ঘুরবে তার বিপরীত দিকে।

লেগ স্পিন বল দেওয়া শক্ত। বিশেষ করে যারা নতুন বল দিতে শিখছে তারা গোড়াতে দেখবে যে, বলে স্পিন দিতে গেলে বলের ডিরেকশান মোটেই ঠিক রাখা যাচ্ছে না, লেংথও গোলমাল হচ্ছে। কাজেই লেগ স্পিন বোলিং ধাপে ধাপে অভ্যাস করা ভালো। প্রথমে স্পিন, তারপরে লেংথ ও ডিরেকশান। বল স্পিন করতে শেখার একটি মাত্র উপায় আছে। সে হচ্ছে অভ্যাস। বিলাতের একজন নামকরা স্পিন বোলার তার পকেটে সর্বদাই একটা বল রাখতেন। সকালে, বিকালে, ঘরে, বাইরে যখন অবসর পেতেন তখনই তিনি বলটাকে আঙ্গুল দিয়ে স্পিন দিতে চেষ্টা করতেন।
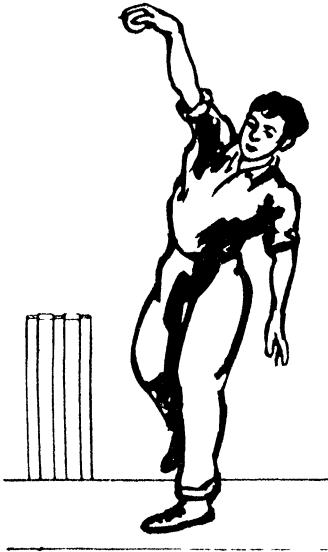
১৯ নং ছবি।
লেগ ব্রেকের ডেলিভারী। বল ছাড়বার আগের মুহূর্ত। হাতের কব্জি নীচের দিকে বেঁকে আছে।

লেগ স্পিন বল দিতে শেখার প্রথম ধাপ হলো কিছুদিন

পিচের মাঝামাঝি জায়গা থেকে আণ্ডার-আর্ম বল দেওয়া। অর্ধেক পিচে লেগ স্পিন দেওয়ার সংকেতটা রপ্ত হওয়ার পরে ধীরে ধীরে আণ্ডার-আর্ম থেকে রাউণ্ড আর্ম এবং রাউণ্ড আর্ম থেকে ওভার আর্ম বল দেওয়া শুরু করবে। ওভার আর্ম লেগ স্পিন বেশ সহজ হয়ে গেলে পর ক্রমশঃ পুরো পিচে লেংথ ও ডিরেকশান বজায় রেখে বল দেওয়া অভ্যাস করবে।

২০ নং ছবি।
লেগ ব্রেকের ফলো-থ্রু। ডান হাতের আঙ্গুল মেলে আছে ব্যাটসম্যানের দিকে।

লেগ স্পিনারকেও শুধু স্পিনের উপর নির্ভর করলে চলে না। বলের গতি ও ফ্লাইট বদল ক'রে ব্যাটসম্যানকে ধোঁকা দিতে হয়।
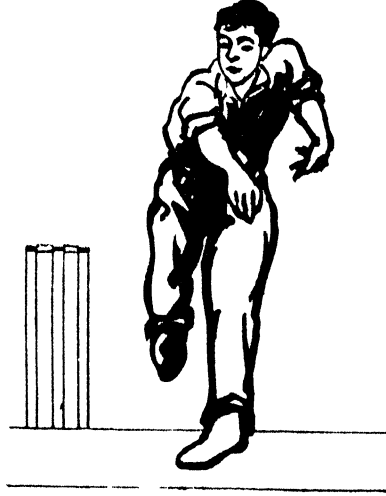
কোনো কোনো নতুন স্লো বোলার হয়তো ভাববে, বলের রকমফের করেই যদি ব্যাটসম্যানকে ঠকাতে হয়, তবে একবার অফ ব্রেক ও অন্যবার লেগ ব্রেক বল দিলেই তো সব চেয়ে বেশী ভালো ফল পাওয়া যাবে। তা' কিন্তু ঠিক নয়। ব্যাটসম্যানকে আউট করতে স্পিন বোলারদের দলের ফিল্ডারের উপর সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতে হয়। অফ ব্রেক ও লেগ ব্রেক বোলারের ফিল্ড আলাদা। এমন ভাবে ফিল্ড সাজানো সম্ভব নয় যা অফ ব্রেক ও লেগ স্পিন দু' ধরনের বলের পক্ষেই কাজে

লাগে। প্রত্যেকটা বলের পরেই তো আর একবার ক'রে ফিল্ডারদের এখানে ওখানে সরিয়ে নেওয়া চলে না। ওভারের মাঝখানে দু' একজন ফিল্ডারকে একটু এগিয়ে পিছিয়ে দিতে দোষ নেই, সে-কথা ঠিক। কিন্তু তাই ব'লে প্রত্যেকটা বলের আগেই যদি এধারের ফিল্ডারকে ওধারে সরাতে হয়, তবে শুধু যে সময় নষ্ট তা' নয়, ফিল্ডসম্যানেরাও হাঁপিয়ে পড়ে। তাদের একাগ্রতাও নষ্ট হয়। বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানকে যে ফিল্ডিং দল অপছন্দ করে তার একটা কারণ এই। একজন ডান-হাতি আর একজন বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান জুটি হলে' ফিল্ড সাজানো কেবলই ওলট পালট করতে হয়।

তাই বলে একথাও যেন কেউ মনে না ভাবে যে, অফ স্পিনারকে কোনো কালেই লেগ স্পিন বল দিতে নেই। সময় বুঝে অফ ব্রেক বোলার মাঝে হঠাৎ দু' একটা বল লেগ ব্রেক দিয়ে বেশ ভালো ফল পেয়ে থাকে।

টপ স্পিন

টপ স্পিন (top spin) কথাটার মানে হলো উপর থেকে নীচের দিকে ঘুরপাক খাওয়া। অফ স্পিনের মতো ডাইনে বা লেগ স্পিনের মতো বাঁয়ে নয়। পায়ের সমুখ থেকে একটা পিপেকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলে পিপেটা যেভাবে গড়াতে থাকে, টপ স্পিনে ক্রিকেট বলটাও ঠিক সেভাবে ঘুরপাক খেতে খেতে ব্যাটসম্যানের দিকে যায়। সে-বলগুলি বড়ই মারাত্মক।

সাধারণতঃ লেগ স্পিন বোলারেরাই টপ স্পিন বেশী কাজে লাগায়। বলটা দেখতে লেগ ব্রেক বলের মতোই। কিন্তু ব্যাটসম্যানের সামনে এসে পিচ খেয়ে বাঁয়ে অর্থাৎ অফের দিকে না বেঁকে সোজা সামনে উইকেটের দিকে ছোটে। টপ স্পিনের ফলে পিচ খাওয়ার পরে বলের গতি কিছুটা বেড়ে যায়। ব্যাটসম্যান বলটাকে লেগ ব্রেক মনে করে বাঁকবার অপেক্ষায় পিছিয়ে মারতে চায় আর অমনি বলটা শাঁ করে সোজা গিয়ে তার পায়ে লাগে। এই কারণে টপ স্পিন বল দিয়ে প্রায়ই এল. বি. ডব্লিউ পাওয়া যায়।

টপ স্পিন বল দেওয়ার কায়দা লেগ ব্রেকের মতোই। শুধু বলটা এমন সময়ে হাত থেকে ছাড়তে হয় যাতে

আঙ্গুলের মোচড়টা পুরোপুরি বলের বাঁ পাশে না দিয়ে উপরে দেওয়া হয়। অনামিকার মোচড়টা লেগ ব্রেকের সময় পড়ে স্লিপের দিকে ; টপ স্পিনের বেলায় পড়বে সোজা ফ্লাইটের লাইনে অর্থাৎ উইকেটের দিকে। ডেলিভারীর মুহূর্তে হাতের তেলো থাকবে মিড-অন মুখো।

টপ স্পিন হলো লেগ ব্রেক আর গুগলীর মাঝামাঝি। কাঁধের একটু নীচ থেকে বল দিয়ে টপ স্পিন শেখা সহজ।

টপ স্পিনের বিপরীত হলো 'ব্যাক স্পিন'। ব্যাক স্পিনের আর একটা নাম হচ্ছে আণ্ডার স্পিন। কারণ ঐ ধরনের বলে স্পিন দেওয়া হয় বলের নীচে। তার ফলে বলটা পিছনের দিকে ঘুরপাক খেতে খেতে ব্যাটসম্যানের কাছে যায়। আমাদের ঐ পিপের দৃষ্টান্তটা দিয়ে বলবো, পিপেটাকে হাত দিয়ে সামনে টানলে সেটা যেভাবে গড়াবে ব্যাক স্পিনে বলের ঘুরপাক খাওয়াটা হচ্ছে সেই রকম। ব্যাক স্পিনের ফলে পিচ খেয়ে বলের গতি অনেক আস্তে হয়ে যায়। টপ স্পিনে বলটা মাটি থেকে খুব সামান্যই লাফিয়ে ওঠে। ব্যাক স্পিন কিন্তু ঠিক তার উল্টো। অনেকখানি লাফায়। তাই ব্যাক স্পিনকে ইংরেজীতে বলা হয় "কিক-আপ" অথবা "সিট আপ" (sit up)।

টপ স্পিন আর ব্যাক স্পিন দুই ই রপ্ত করা কঠিন। তবে একজন পাকা লেগ ব্রেক বোলার ধীরে ধীরে টপ স্পিন ও ব্যাক স্পিন দুই-ই অভ্যাস করে' তার বলের রকমারি বাড়াতে পারে।

গুগলী

লেগ ব্রেকের মতো দেখতে অথচ পিচ খেয়ে অনের দিকে বেঁকে যায় এমন বলকে বলে গুগলী। অর্থাৎ গুগলী হলো সে-বল যা' বোলার লেগ ব্রেকের কৌশলে হাত থেকে ছাড়লেও আসলে হচ্ছে অফ ব্রেক। এজন্যেই এর আর একটা নাম হলো রং-আন (wrong-un)। সাধারণতঃ যারা ডান হাতে বল দেয় তারাই গুগলী দিতে পারে। বাঁ হাতি বোলার, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাদের বলে লেফ্‌ট আর্ম বোলার, তারা বড় একটা গুগলী দেয় না। বাঁ হাতি বোলার ডান হাতি বোলারের মতো লেগ ব্রেকের ভঙ্গিতে অফ ব্রেক বল দিলে তাকে বলে 'চীনাম্যান'। আমাদের মানকাদ 'চীনাম্যান' দিয়ে অনেক পাকা ব্যাটসম্যানকে আউট করে থাকেন।

গুগলী বল আবিষ্কার করেন বিলাতের স্পিন বোলার বি. জে. টি. বসেঙ্কোয়েট। এজন্যে গুগলীর আর একটা চলতি নাম হয়েছে—"বসী" (bosie)। গুগলীর গ্রিপ আর লেগ স্পিনের গ্রিপে কোনো তফাৎ নেই। শুধু ডান কব্জিটা এতখানি বেশী মোচড় দিতে হয় যাতে বলটা ছাড়বার আগের মুহূর্তে হাতের পিঠটা ব্যাটসম্যান মুখো হয়। ব্যাটসম্যান দেখতে পায় বলটা যেন বোলারের আঙ্গুলগুলির পিছন থেকে উঠে আসছে। বলটা ছাড়বার সময় বোলারের বাঁ কাঁধটা নীচের দিকে কাত হয়ে পড়ে।

গুগলী দিতে বাঁ পা ডান পায়ের সঙ্গে এক লাইনে রাখা সুবিধাজনক। বাঁ পায়ের টো থাকবে ব্যাটসম্যান-মুখো। একষট্টি পৃষ্ঠায় ছবি দেখলে বল দেওয়ার ভঙ্গি পুরোপুরি বোঝা যাবে।

গুগলী বল দেওয়া খুবই শক্ত। কারণ হাতটাকে মোচড় দিয়ে এমন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে আনতে হয় যে, হাতে ব্যথা লাগে, অথচ বলের লেংথ ও ডিরেকশানও ঠিক হতে চায় না। তবে ছোট ছেলেদের হাত নরম। তারা কিছু দিন অভ্যাস করলেই হাতকে অনেকখানি বেশী বাঁকাতে পারে। কাজেই তাদের পক্ষে গুগলী দিতে শেখা কিছু অসাধ্য কাজ নয়।

কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছি। গুগলী অভ্যাস করতে গিয়ে অনেক তরুণ বোলার তাদের স্বাভাবিক ভাবে বল দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গুগলী ছাড়া অন্য আর কোনো ধরনের বল আর তখন তাদের হাতে আসে না। তা'হলে কিন্তু সর্বনাশ। কারণ পর পর শুধু গুগলী বল দিয়েই কোন ব্যাটসম্যানকে আউট করা যায় না। গুগলী শুধু এই জন্যেই কাজে লাগে যে, সেটা অন্য বলের চাইতে আলাদা। খুব লক্ষ্য না করলে বোলারের ভঙ্গি থেকে আঁচ করা যায় না। কিন্তু ক্রমাগত গুগলী দিতে থাকলে ব্যাটসম্যান তাতে এতই অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে, সে-বল চিনতে তা'র একটুও অসুবিধা হবে না। এজন্যেই যারা গুগলীতে ওস্তাদ তা'রাও অনেক রয়ে-সয়ে হঠাৎ একটা গুগলী দেয়।

গুগলী হচ্ছে বোলিং-এ চাটনির মতো। মাছ মাংস ও অন্য আর পাঁচটা জিনিষের সঙ্গে খাওয়ার স্বাদ বাড়ায়। শুধু চাটনি খেয়ে তো কেউ পেট ভরাতে পারে না।
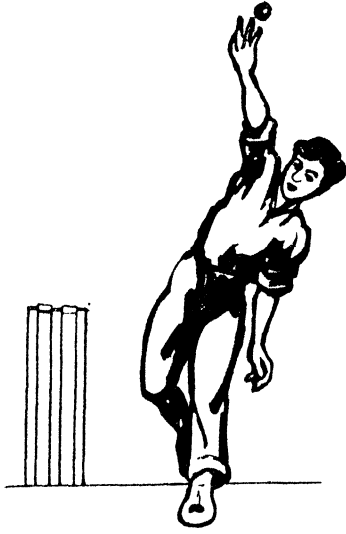
২১ নং ছবি।
গুগলী হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পরের মুহূর্ত। হাতের পিছনটা ব্যাটসম্যান-মুখো। বলটা যেন আঙ্গুলের পিছন থেকে উঠে আসছে। বাঁ কাঁধ নীচু, বাঁ পা ডান পায়েব লাইনে।

২২ নং ছবি।
গুগলীর ফলো-থ্রু। ডান কাঁধ নীচু, হাত মোচড় খেয়ে ঘুরেছে। কনুইটা শর্ট লেগের দিকে। হাতের তেলো প্রায় লেগ স্টাম্প-মুখো।

লেংথ ও ডিরেকশান বজায় রেখে গুগলী দিতে জানা থাকা বোলারের পক্ষে খুবই ভালো কথা। লেগ-স্পিনার হঠাৎ একটা গুগলী দিয়ে উইকেট পেতে পারে। তা' যদি বা না পায়, ব্যাটসম্যানকে দাবিয়ে রাখতে পারে। কারণ বোলার গুগলী দিতে জানে একথা টের পাওয়া মাত্র ব্যাটসম্যান সর্বদাই আশঙ্কায় থাকে,—কী জানি কখন একটা গুগলী আসছে। অতিরিক্ত সাবধান হতে গিয়ে তার খেলায় আড়ষ্টতা আসে। মন খুলে' স্ট্রোক করতে পারে না। রান কম হয়।

কিন্তু বোলার যদি ভালো অফ-স্পিনার বা লেগ-স্পিনার হয় এবং ফ্লাইট ও গতি বদল করে' বলে রকমারি আনতে পারে, তবে গুগলী একেবারে না জানলেও তা'কে কেউ ছি ছি করবে না। ইংলণ্ডের নামজাদা টেস্ট বোলার সি. এস. ম্যারিয়ট মোটেই গুগলী দেওয়ার কায়দা জানতেন না। শুধু টপ স্পিন আর লেগ ব্রেক দিয়েই তিনি বড় বড় ব্যাটসম্যানদের ঘায়েল করেছেন।

যদিও গুগলী বল প্রথম আবিষ্কার হয়েছে ইংলণ্ডে, সেটা সব চেয়ে বেশী চলতি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। গুগলী আবিষ্কারের পর থেকে সেখানকার প্রায় প্রত্যেক টেস্ট টীমেই অন্ততঃ একজন ভালো গুগলী বোলার রয়েছে। ১৯০৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার যে-টীম বিলাতে টেস্ট খেলতে যায় তাতে শোয়ার্জ, ভলগার, ফাকনার ও হোয়াইট এই চার জন বোলার ছিল, যারা প্রত্যেকেই পাকা গুগলী বোলার।

মিডিয়ম পেস বোলিং

মিডিয়ম পেস বোলার ফাস্ট বোলারের সুইং আর স্লো বোলারের স্পিন দুই-ই কিছুটা কাজে লাগায়। তবে মিডিয়ম পেসে সোয়ার্ভ বলই বেশী মারাত্মক হয়। মিডিয়ম পেস বোলার এক হিসাবে দলের পক্ষে উপকারী। তা'র বলে ব্যাটসম্যানেরা বেশী রান তুলতে পারে না। ফাস্ট বোলারদের বলে শ্লিপের পাশ দিয়ে দু' একটা মার বাউণ্ডারীতে পৌঁছবে আর স্লো বোলারেরাও কখন কখনও লেংথ গোলমাল করে' ব্যাটসম্যানকে কষে পিটাবার সুযোগ দেবে, এ প্রায় জানা কথা। শুধু পাকা মিডিয়ম পেস বোলারেরাই বরাবর লেংথ ও ডিরেকশান বজায় রেখে বল দিতে পারে। তাই যখন বিপক্ষ দলের রান সংখ্যা দাবিয়ে রাখা দরকার, তখন মিডিয়ম পেস বোলারদের ডাক পড়ে।

অবশ্য মিডিয়ম পেস বোলারের একটা অসুবিধাও আছে। যতক্ষণ বলের পালিশ থাকে, ততক্ষণ ফাস্ট বোলারেরা বল দেয়। মাঠে যখন ধুলো জমে বা মাটি আলগা হয়ে আসে তখন বল দিতে আসে স্পিন বোলারেরা। মিডিয়ম পেস বেচারী না পায় সহজে সুইং করবার উপযুক্ত নতুন বল, না পায় সহজে স্পিন করবার মতো ক্রাম্বলিং পিচ। উইকেট পেতে সে পেসের অদল বদল করে বা বোলিং ক্রীজে কখনও স্টাম্পের গা থেকে কখনও বা একটু দূরে সরে' বলে রকমারি আনে।

যারা ফাস্ট মিডিয়ম অর্থাৎ প্রায় ফাস্ট বোলারের কাছাকাছি জোরে বল দেয়, তারা কেউ কেউ একটা নতুন কৌশল খাটায় যার নাম হলো "লেগ কাটার"। ভেজা মাঠে লেগ কাটার বড়ই মারাত্মক। ইন সুইঙ্গার বোলার লেগ কাটার দিলে ইন সুইঙ্গার বল পিচ খেয়ে অনেকটা লেগ স্পিনের মতো ব্যাটসম্যান থেকে বাইরে অর্থাৎ অফের দিকে চলে যায়। আজকাল ইংলণ্ডের এলেক বেডসার এ ধরনের বোলারদের মধ্যে সেরা। এই লেগ কাটার দিয়েই বিলাতের টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের এবং এবার অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের তিনি আউট করেছেন। ভিজে মাঠে বলটাকে লেগ স্পিনারের কৌশলে কিন্তু ফাস্ট বোলারের মতো জোড়ে ছুঁড়লেই সেটা অনেকখানি লেগ কাটার হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য অনামিকা দিয়ে বলটাকে স্পিনের ভঙ্গিতে কেটে দিতে হয় তাতে বেশী লিফট পাওয়া যায়। বলটা আঙ্গুলে শক্ত করে চেপে ধরবে। কিন্তু কব্জি যেন শক্ত করবে না। লেগ কাটারে ব্যাটসম্যান যাতে ফরোয়ার্ড খেলতে বাধ্য হয় সেজন্যে বলটাকে ব্যাটসম্যানের কিছুটা কাছে ফেলতে হয়। লেগ কাটার লেগ স্টাম্প নিশানা করা ভালো। শুকনো মাঠে ডেলিভারীর মুহূর্তে মাঝের আঙ্গুল দিয়ে বলের সেলাইটাকে আড়াআড়ি ভাবে কেটে দিতে হয়।

লেগ কাটার বল দেওয়া বেশ কঠিন। অনেক দিন অভ্যাস ও অনেক পরিশ্রম না করলে কোনো বোলার লেগ কাটার শিখতে পারে না।

বাঁ-হাতি বোলার

এই বই-এর আগের পৃষ্ঠাগুলিতে বোলিং-এর যে-সব কায়দা কৌশল বলা হয়েছে তা' সমস্তই এমন বোলারদের জন্যে যারা ডান হাতে বল দেয়। বাঁ-হাতি বোলার অর্থাৎ চলতি কথায় আমরা যাকে নেটা বোলার বলি, তাদের জন্যে আলাদা করে কিছু বলা দরকার।

বিলাতে বাঁ-হাতি বোলারদের একটা বিশেষ কদর আছে। কারণ সেখানকার নরম মাটি ও স্যাৎসেঁতে আবহাওয়া বাঁ-হাতি বোলারদের খুব কাজে লাগে। এমন কি বিলাতের গোঁড়া ক্রিকেট পণ্ডিতেরা বলেন যে, অন্ততঃ একজন বাঁ-হাত বোলার না থাকলে কোনো ক্রিকেট টীমই শক্তিশালী হয় না। এটা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট টীম অনেকবার বাঁ-হাতি বোলার ছাড়াই ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়েছে। তবে এ-কথা মানতেই হবে যে, দলে একজন বাঁ-হাতি বোলার থাকলে বোলিং-এর রকমারি বাড়ে।

বাঁ-হাতি বোলারের সংখ্যা সব দেশেই কম। কাজেই ব্যাটসম্যানেরা সাধারণতঃ তাদের বলে খেলতে অভ্যস্ত নয়। বাঁ-হাতি বোলারদের আর একটা সুবিধা এই যে, তাদের স্বাভাবিক স্পিন হলো লেগ ব্রেক। কাজেই তা'রা ডান-হাত লেগ

স্পিনারদের চাইতে অনেক সহজেই লেংথ বজায় রেখে লেগ ব্রেক ও টপ স্পিন দিতে পারে। পিচ খেয়ে বাইরে অর্থাৎ অফের দিকে বেঁকে যায় এমন বলই ব্যাটসম্যানের পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধাজনক সে-তো আগেই বলেছি।

বোলিং-এর মূল কৌশল অর্থাৎ বেসিক য়্যাকশন বাঁ হাতি বোলারদের বেলায় হুবহু এক। স্পিন ও ফ্লাইটের সংকেতও তাই। বোলিং ক্রিজে স্টাম্পের কোন দিকে দাঁড়িয়ে বল দিতে হবে তফাৎ শুধু সেখানে। সাধারণতঃ ডান-হাতি বোলার বল দেয় ওভার দি উইকেট। আর বাঁ-হাতি বোলার দেয় রাউণ্ড দি উইকেট। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বড় ম্যাচে শেষের দিকে, বাঁ-হাতি বোলার ওভার দি উইকেট বল দিয়ে ভালো ফল পায়। কারণ উল্টো দিকের বোলার ফলো থ্রু'তে পায়ের চাপে পিচের যেখানটা মাটি কিছুটা জখম করেছে, বাঁ হাতি বোলার ওভার দি উইকেট বল দিয়ে ঠিক সেখানে পিচ খাইয়ে অনেক বেশী স্পিন পেয়ে থাকে। ব্যাটসম্যানও যদি বাঁ-হাতি হয় তবে বাঁ-হাতি বোলার ওভার দি উইকেট বল দিয়ে বরাবর ঐ জখম-হওয়া জায়গায় পিচ খাওয়ালে সহজেই উইকেট পাওয়ার আশা থাকে।

'চীনাম্যান' দিতে বাঁ-হাতি বোলার ওভার দি উইকেট বল দেয়। আমাদের ভিনু মানকাদ ও অস্ট্রেলিয়ার জর্জ ট্রাইবকে যারা ইডেন গার্ডেনে বল দিতে দেখেছে, তারা সেটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে।

যারা বাঁ হাতে বল দেয় তাদের মধ্যে ফাস্ট বোলার বড় বেশী দেখা যায় না। এমন কি একমাত্র বিল ভোস এবং ই. ডব্লিউ.

ক্লার্ক ছাড়া বিলাতেও বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার হিসাবে আর কেউ খুব নাম করেন নি। মিডিয়াম ফাস্টের দলে অস্ট্রেলিয়ার বিল জন্‌সন অবশ্য খুবই মারাত্মক বোলার। বাঁ-হাতি স্লো বোলারদের মধ্যে ভারতবর্ষের মানকাদ, বিলাতের রোডস ও ভেরিটী এবং অস্ট্রেলিয়ার ফ্লিট উড স্মিথ জগৎ-বিখ্যাত।

বাঁ-হাতি স্লো বোলার অনেক সময় 'লেগ ট্র্যাপের' বদলে 'অফ ট্র্যাপ' ফন্দিটা কাজে লাগায়। খুব আক্রমণমূলক অফ ট্র্যাপে দুজন শ্লিপ, গালী, সিলী মিড অফ ও কভার পয়েন্ট দাঁড় করিয়ে বাঁ-হাতি স্লো বোলার রাউণ্ড দি উইকেট বল দেয়, তাতে প্রায়ই উইকেট পায়। রাউণ্ড দি উইকেট বল দিতে বাঁ হাতি স্লো বোলার স্টাম্পের গা থেকে বল ছাড়ে। ঐ ধরনের বোলার যদি ওভার দি উইকেট বল দিতে চায়, তবে লেগে ফিল্ডার রেখে লেগ স্টাম্প নিশানা করলে ভালো ফল পাবে।

যারা বাঁ-হাতে বল দেয় তারা যে বাঁ-হাতে ব্যাটও করবে, এমন কথা নেই। অনেক ক্রিকেটার আছে যারা ব্যাট করে স্বাভাবিক অর্থাৎ ডান-হাতি অথচ বল দেয় বাঁ-হাতে। আমাদের ভিনু মানকাদ হচ্ছেন এই দলে।

ফিল্ড সাজানো

গোড়াতেই বলেছি, উইকেট পাওয়ার জন্য বোলারকে ফিল্ডসম্যানদের উপরে অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। রান বাঁচাতেও তাই। কাজেই কী করে' ফিল্ড সাজাতে হয়, বোলারের পক্ষে সেটা জানা দরকার। ম্যাচ খেলায় ক্যাপ্টেন হলো ফিল্ড সাজাবার কর্তা। কিন্তু ক্যাপ্টেন সর্বদাই বোলারের সঙ্গে পরামর্শ করে' ফিল্ড সাজায়। কারণ কোন বোলার কী ধরনের বল দেয় তা' বুঝেই ফিল্ডারদের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করাতে হয়।

ফিল্ড সাজাবার মোটামুটি নিয়ম এই যে, বোলারের বলটা পিচ খেয়ে যে-দিকে বাঁকবে সে দিকেই ফিল্ডসম্যান বেশী রাখতে হয়। আউট সুইঙ্গার ও লেগ স্পিন বল দিলে অফের দিকে বেশী ফিল্ডার রাখা হয়, ইন সুইঙ্গার ও অফ স্পিনে অনের দিকে। যখন রান বাঁচাবার চাইতে ব্যাটসম্যানকে আউট করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য, তখন সামনে যেমন,—শর্ট লেগ, স্কোয়ার লেগ, শ্লিপ, গালী, সিলী পয়েণ্ট, সিলী মিড-অন বেশী রাখা প্রয়োজন। আর যখন রান তোলা বন্ধ করা লক্ষ্য, তখন আউট ফিল্ডে অর্থাৎ দূরে যেমন,—লং অন আউট ফিল্ড, স্ট্রেট হিট আউট ফিল্ড, এক্সট্রা কভার বেশী দাঁড় করাতে হয়। প্রথমটাকে বলে য়্যাটাকিং ফিল্ড অর্থাৎ আক্রমণমূলক ফিল্ড সাজানো। দ্বিতীয়টাকে বলে ডিফেন্সিভ ফিল্ড অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক।
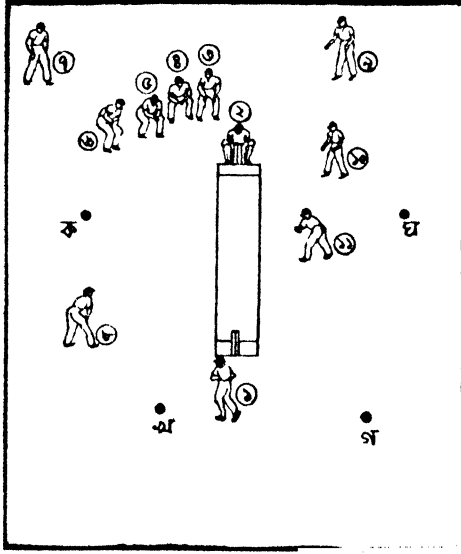
২৩ নং ছবি।

ফাস্ট বোলারের ফিল্ড

১। বোলার
২। উইকেট কীপার
৩। ফার্স্ট স্লিপ
৪। সেকেণ্ড স্লিপ
৫। থার্ড স্লিপ
৬। গালী
৭। থার্ড ম্যান
৮। কভার পয়েণ্ট
৯। ফাইন লেগ
১০। শর্ট লেগ
১১। ফরোয়ার্ড শর্ট লেগ

২৪ নং ছবি।

আউট স্যুইঙ্গারের ফিল্ড

১। বোলার
২। উইকেট কীপার
৩। ফার্স্ট স্লিপ
৪। সেকেণ্ড স্লিপ
৫। গালী
৬। থার্ড ম্যান
৭। কভার পয়েণ্ট
৮। মিড অফ
৯। মিড অন।
১০। ফাইন লেগ
১১। স্কোয়ার লেগ
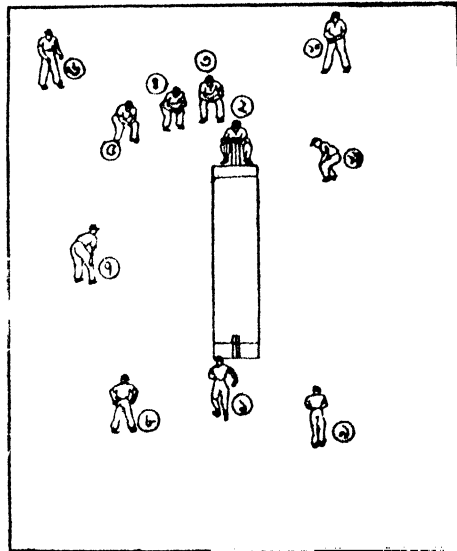
ফাইন লেগে একজন ফিল্ডার না রাখলে ফাস্ট বোলার নির্ভয়ে বল দিতে পারে না। কারণ খুট করে ব্যাটে লেগে বল সেখান দিয়ে বাউণ্ডারীতে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। থার্ড ম্যানও রাখা দরকার। লেগ স্পিনারের কাজ হলো উইকেট নেওয়া, সাধারণতঃ রান দাবিয়ে রাখার জন্যে সে নয়। কাজেই সে যাতে নিশ্চিন্তে যথেষ্ট এগিয়ে বল পিচ খাওয়াতে পারে, তার জন্যে তাকে দুজন আউট ফিল্ডার—একজন প্রায় তা'র পিছনে আর একজন ডিপ এক্সট্রা কভারে—দেওয়া উচিত। তা'রা বাউণ্ডারী বাঁচাবে।

ব্যাটসম্যানের খেলার ধরনের উপরেও ফিল্ড সাজানো নির্ভর করে। যে-ব্যাটসম্যান ড্রাইভ, কাট ইত্যাদি বেশী করে তার জন্যে অফে বেশী ফিল্ডার রাখতে হয়, আবার যে-ব্যাটসম্যানের বেশীর ভাগ স্ট্রোক অনের দিকে তার জন্যে ফিল্ড সাজানো হয় সেই দিকে।

পাকা ব্যাটসম্যানকে লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলতে অনেক সময় কিন্তু এই নিয়মের ঠিক উল্টোটি করা হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একজন ব্যাটসম্যান কভার ড্রাইভ খুব পছন্দ করে। কভার পয়েণ্ট ও এক্সট্রা কভারে ফিল্ডার থাকলে সে খুব নিশ্চিত না হয়ে সে-স্ট্রোক করে না। বোলার তখন ইচ্ছে করেই ঐ জায়গা দুটো খালি রাখে, কিন্তু অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে বল দেয় সাধারণত যা ড্রাইভ না করে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু ব্যাটসম্যান কভারে খালি মাঠ দেখে বাউণ্ডারী করার লোভে বেপরোয়া ব্যাট চালায়। আর অমনি ব্যাটের আনাচে কানাচে লেগে ক্যাচ ওঠে গালী বা শ্লিপের হাতে।
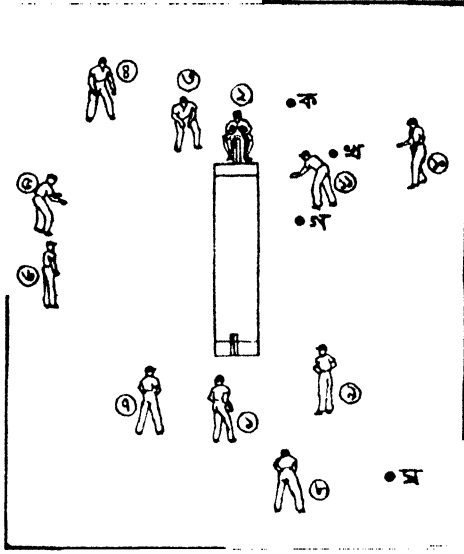
২৫ নং ছবি।
ওভার দি উইকেট অফ স্পিনারের ফিল্ড।

১। বোলার
২। উইকেট কীপার
৩। স্লিপ
৪। শর্ট থার্ড ম্যান
৫। কভার পয়েন্ট
৬। এক্সট্রা কভার
৭। মিড অফ
৮। লং অন বা স্ট্রেট হিট
৯। মিড অন
১০। ডিপ স্কোয়ার লেগ
১১। স্কোয়ার লেগ

২৬ নং ছবি।
লেগ ব্রেকে রান বাঁচাবার ফিল্ড

১। বোলার
২। উইকেট কীপার
৩। স্লিপ
৪। শর্ট থার্ড ম্যান
৫। কভার পয়েন্ট
৬। এক্সট্রা কভার
৭। ডিপ্‌লং অফ্
৮। মিড অফ্
৯। সিলী মিড অফ্
১০। মিড অন
১১। মিড উইকেট
১২। ডিপ স্কোয়ার লেগ
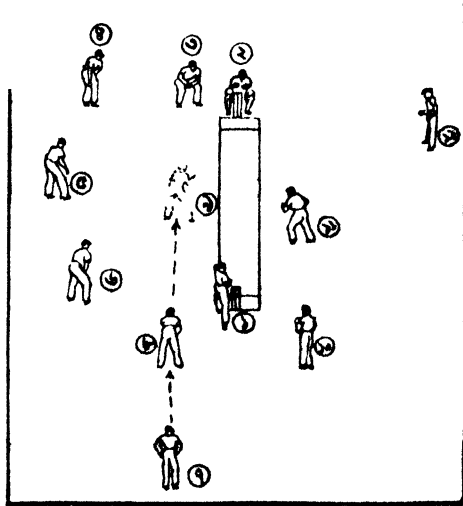
কোন বোলার কী রকম ভাবে ফিল্ড সাজাবে তার একটা মোটামুটি ধারণা উনসত্তর ও একাত্তর পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। তেইশ নম্বর ছবিতে আছে ফাস্ট বোলারের ফিল্ড। সেটা মিডিয়ম ফাস্ট ইন সুইঙ্গারের জন্যে কাজে লাগাতে ছ' নম্বর ফিল্ডারকে 'ক', আট নম্বরকে 'খ', পাঁচ নম্বরকে 'গ' ও এগারো নম্বরকে 'ঘ' লেখা জায়গায় সরিয়ে দিলেই চলবে।

পঁচিশ নম্বর ছবির ফিল্ডকে একটু রকমফের করলে রাউণ্ড দি উইকেট অফ স্পিনারের কাজে লাগবে। তখন আট নম্বরকে 'ঘ', এগারো নম্বরকে 'গ', তিন নম্বরকে 'ক' ও পাঁচ নম্বরকে 'খ' লেখা জায়গায় সরিয়ে আনতে হবে।

লেগ ব্রেকের ডিফেন্সিভ অর্থাৎ রান বাঁচাবার উপযুক্ত ফিল্ড দেখানো হয়েছে ছাব্বিশ নম্বর ছবিতে। সেই ফিল্ডকেই সামান্য বদলে য়্যাটাকিং ফিল্ড করা যায়। তখন সাত নম্বরকে ন' নম্বরে, ছ' নম্বরকে সেকেণ্ড শ্লিপে অর্থাৎ তিন নম্বরের কাছাকাছি সরিয়ে আনতে হবে। এগারো নম্বরকে শর্ট লেগে দাঁড় করাতে হবে। আট নম্বর দাঁড়াবে বারো নম্বর জায়গায়।

ফিল্ড সাজানো শুধু বলের ধরন বা ব্যাটসম্যানের মারের কায়দার উপরেই নির্ভর করে না। পিচের মাটি, খেলার হার-জিতের অবস্থা দিয়ে তার রকমফের করতে হয়। কাজেই এ ব্যাপারে একেবারে চুল-চেরা নিয়ম বেঁধে দেওয়া অসম্ভব। বোলার ও ক্যাপ্টেন খেলতে খেলতে যতই অভিজ্ঞতা লাভ করবে, ততই তা'রা অবস্থা বুঝে নির্ভুল ফিল্ড সাজাতে পারবে।

বোলার যেন মনে রাখে

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্যাপ্টেন ও টেস্ট বোলার গাবী য়্যালেনকে একদিন একজন তরুণ খেলোয়াড় জিজ্ঞাসা করেছিল,—"স্যর, বোলিং-এ উন্নতি করা যায় কী করে?"

জবাবে য়্যালেন শুধু একটি কথা বললেন—"প্র্যাকটিস"।

ছেলেটি প্রশ্ন করল, "তার পর?"

য়্যালেন বললেন, "আরও প্র্যাকটিস।"

নতুন উৎসাহী বোলার নাছোড়বান্দা। আবার জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, তার পর?"

য়্যালেন বললেন, "আরও বেশী প্র্যাকটিস"।

ছেলেটি সন্তুষ্ট হয়েছিল কিনা তা' অবশ্য জানা নেই। য়্যালেনের জবাবটা কিন্তু ষোল আনা খাঁটি। যত বেশী প্র্যাকটিস করবে ততই বোলিং নিখুঁত হবে।

গোড়াতেই নিজের স্বভাব এবং স্বাস্থ্য বুঝে ফাস্ট বোলিং আর স্লো বোলিং-এর মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে। ঠিক করতে হবে, কী ধরনের বল দেওয়া শিখতে চাও। ফাস্ট বোলিং-এ শারীরিক পরিশ্রম অনেক বেশী, তাই ফাস্ট বোলারেরা অল্প দিনেই ফুরিয়ে যায়। বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠা পার হলেই তাদের দম পড়ে আসে, বলের জোর কমতে থাকে। সে-দিক

দিয়ে স্লো বোলারদের সুবিধা। স্লো বলের ধকল কম, তাই অনেক বছর অবধি স্লো বোলার বড় ম্যাচে খেলতে পায়।

কিন্তু আমাদের দেশে যে-সব তরুণ বোলার ভবিষ্যতে টেস্ট ম্যাচে খেলার স্বপ্ন দেখে তাদের একটা কথা ভেবে দেখা দরকার। ভারতবর্ষে এখন ফাস্ট বোলার নেই। ফাস্ট বোলারের অভাবে ভারতীয় দল টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। এদেশে ক্রিকেট খেলার যারা কর্তা, সেই ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড, চার দিকে ফাস্ট বোলার খুঁজে বেড়াচ্ছেন। নতুন বোলারদের মধ্যে যে এখন ফাস্ট বোলিং এ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে, সে খুব সহজে আর খুব শিগ্গির টেস্ট টীমে জায়গা পাবে। সুতরাং স্বাস্থ্য ভালো, গড়ন লম্বা ও শরীর মজবুত এমন তরুণেরা স্লো বোলিং এর চাইতে ফাস্ট বোলিং-এ মন দিলে তাড়াতাড়ি নাম করার আশা আছে।

যারা ফাস্ট বোলার হতে চাও, তারা নিজের পা দুটির খুব যত্ন নেবে। একথা শুনে অনেকে হয়তো হেসে উঠবে। বলবে, —"ফুটবল তো খেলতে যাচ্ছি না, পায়ের সঙ্গে বোলিং এর সম্পর্কটা কোনখানে?"

সম্পর্ক আছে এবং খুব বেশী পরিমাণেই আছে। পায়ে যথেষ্ট জোর না থাকলে কোনোকালেই বলে 'জোর' হবে না। পায়ের পাতা অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে ফুট, আর হাটুর নীচের অংশ ইংরেজীতে যাকে বলে লেগ, যেন ব্যথায় আড়ষ্ট না থাকে। ফোস্কা-পড়া, কেটে বা ছড়ে-যাওয়া পা নিয়ে কষ্টে-স্বষ্টে কোনো মতে ব্যাট করা হয়তো চলে; কিন্তু বল দেওয়া

চলে না। ফাস্ট বোলিং তো আদপেই না। এবার বোম্বেতে সিলভার জুবিলী টীমের সঙ্গে টেস্ট খেলায় গোপীনাথ তার খোঁড়া পা নিয়ে নট আউট সাতষট্টি রান করেছেন। অথচ পায়ের শিরায় টান লাগার ফলে ফাদকার ওয়েস্ট ইণ্ডিজে কয়েকটা ম্যাচে মাঠে নামতেই পারেন নি। বিলাতের একজন বিখ্যাত ক্রিকেটের মাস্টার বলতেন, শুধু পা দেখেই তিনি আঁচ করতে পারেন, বোলার কোন ধরনের।

বল দিতে বাঁ পা শরীরের খুঁটির মতো কাজে লাগে। কাজেই সে পা যাতে শক্ত করে মাটি আঁকড়ে ধরতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। বিশেষতঃ ফাস্ট বোলারদের পা যদি ফস্কে যায়, তবে আছাড় খেয়ে জখম হওয়ার আশঙ্কা। এজন্যে বল দিতে এক জোড়া ক্রিকেটের বুট পরে নেওয়া ভালো। সাধারণ ফিতে বাধা চামড়ার জুতোর তলায় স্প্রাগ বসিয়ে নিলে তাতেও কাজ চলে। কেডস পায়ে না দেওয়াটাই নিরাপদ। সে-জুতোর তলাটা রবারের, তাই পিছলে যাওয়ার ভয় থাকে। এক জোড়া মোটা উলের মোজা পরলে পায়ে অনেক আরাম লাগে। উলের মোজার অভাবে সুতোর মোজাই এক জোড়ার উপরে আরেক জোড়া পরা চলে। বল দেওয়ার পরিশ্রমে শরীর ঘেমে যায়, তখনি ঠাণ্ডা লাগলে শক্ত অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা। তাই ওভার শেষ হলেই একটা গরম পুলোভার গায়ে দেওয়া ভালো।

ম্যাচ খেলায় বোলারের কখনও অবসর নেই। যখন সে বল দেয় না, তখনও অন্যান্য ফিল্ডারের মতো সে শুধু রান

আটকানো বা ক্যাচ লোফার কথা ভাবে না, ব্যাটসম্যানকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে। ব্যাটসম্যান কী ভাবে খেলছে— এগিয়ে, না, পিছিয়ে, অফে বেশী স্ট্রোক, না, অনে—তার উপরে সে কড়া নজর রাখে। ব্যাটসম্যানের দুর্বলতা ও মারের ধরন বুঝে সে ফন্দি আঁটতে থাকে, যখন তার বল দেওয়ার পালা আসবে, তখন কোন ব্যাটসম্যানকে কী ভাবে আউট করবে।

কোনো কোনো ব্যাটসম্যান অফ ও মিডল স্টাম্প সোজা বল, এমন কি অফ স্টাম্পের সামান্য একটু বাইরের বলকেও অনের দিকে মারে। অন সাইডে বেশী ফিল্ডার রেখে বোলার যদি লেগ স্টাম্পের উপরে বল দেয়, তবে সহজে উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা। কারণ অনে ব্যাট চালাতে ব্যাটসম্যানকে উইকেটে আড়াআড়ি ভাবে অর্থাৎ অফের দিকে একটু সরতে হয়। ফলে লেগ স্টাম্প খোলা থাকে বলের মুখে। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান আর্থার মরিসকে বেডসার অনেক বারই এই কৌশলে আউট করেছেন।

ব্যাটসম্যানের দুর্বলতা ও বেশী পছন্দসই স্ট্রোক ধরে ফেলার সুবিধা এই যে, বোলার তাড়াতাড়ি আউট যদি বা না করতে পারে, অন্ততঃ অনেক রান দাবিয়ে রাখে। ইংলণ্ডের নামজাদা অল রাউণ্ডার হ্যামণ্ড লেগ স্টাম্পের উপর বল তেমন মারতে পারতেন না। শেষবার যখন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন হয়ে যান, তখন অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরা তা' বুঝে ফেলে। তারা কেবলই লেগ স্টাম্প তাক করে বল দিতে

উপরে ডাইনে—অস্ট্রেলিয়ার উদীয়মান ব্যাটসম্যান তরুণ আয়ান ক্রেগ। তাঁ'কে অনেকে বলেন, ভবিষ্যতের ব্র্যাডম্যান।

*

মাঝে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিনজন সেরা ব্যাটসম্যানের মধ্যে একজন,—ক্লাইড ওয়ালকট।

*

নীচে ডাইনে—পৃথিবীর একজন সেরা অলরাউণ্ডার,—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফ্রাঙ্ক ওরেল।

*

নীচে বাঁয়ে—প্রথম বাঙ্গালী যিনি টেস্ট ম্যাচ খেলেন। উইকেট কীপার প্রবীর সেন।
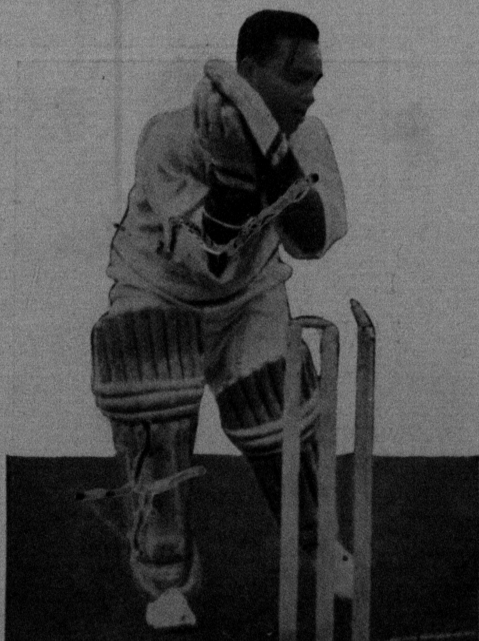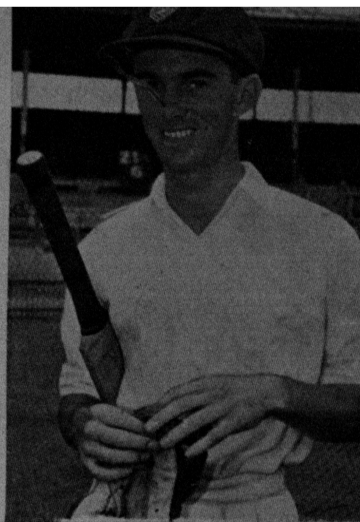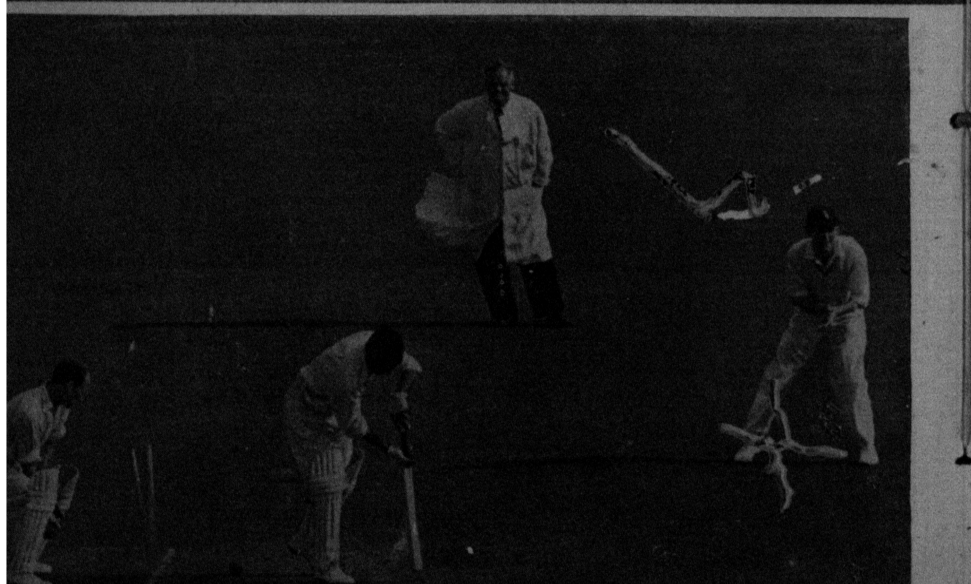
একশ' আঠারো পৃষ্ঠায়
চিত্র-পারচয় দেওয়া আছে

এঁরা কা'রা ?

একশ' আঠারো পৃষ্ঠায়
চিত্র-পরিচয় দেখো
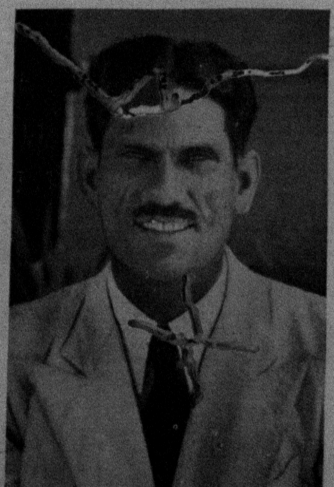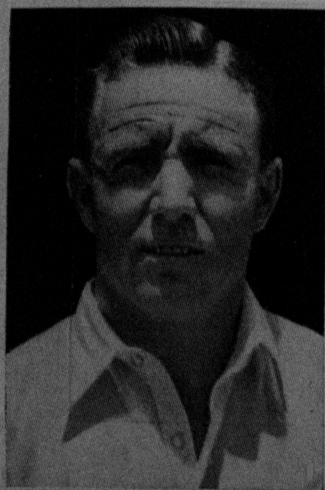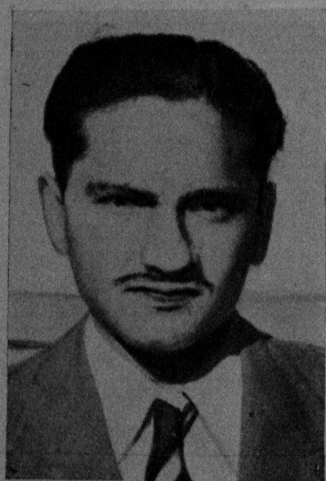
থাকে। ফলে হ্যামণ্ড তাঁর অতি বিখ্যাত কভার ড্রাইভ করার স্যর সুযোগ পেতেন না, রানও বেশী তুলতে পারতেন না।

বেশীর ভাগ ব্যাটসম্যানই শূন্য কাটিয়ে ওঠার জন্যে ব্যস্ত থাকে। বোলারের লক্ষ্য হবে নতুন ব্যাটসম্যানকে যতক্ষণ সম্ভব এক রানও করতে না দেওয়া। চার পাঁচ ওভারেও এক করতে না পারলে অনেক সময়েই ব্যাটসম্যান ধৈর্য হারিয়ে যা' তা' করে' ব্যাট চালায়, আর আউট হয়।

জুটির একজন ব্যাটসম্যান ব্যাটিং-এ কাঁচা হলে, অন্যজন ফর্মিং দি বোলিং করে। অর্থাৎ আনাড়ি ব্যাটসম্যানকে যাতে বোলিং-এর মুখে পড়তে না হয়, এজন্যে জুটির পাকা ব্যাটসম্যান ওভারের ঠিক শেষ বলটিতে এক রান নিয়ে অন্য দিকের উইকেটে চলে যায়। তখন বোলারের লক্ষ্য হবে, ব্যাটসম্যানকে ওভারের শেষ বলে রান করতে না দেওয়া।

দু'দিকের বোলারদের মধ্যেও খুব বোঝাপড়া থাকা চাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, একজন বোলার খুবই ভালো বল দিচ্ছে, অথচ উইকেট সে পাচ্ছে না, পাচ্ছে তা'র সাথী উল্টো দিকের বোলার। তার কারণ এই যে, ব্যাটসম্যান প্রথম বোলারের বলে মোটেই সুবিধা করতে না পেরে দ্বিতীয় বোলারের কাছে তাড়াহুড়ায় রান নেওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে আউট হচ্ছে। হ্যারল্ড লারুডের জুটি বোলার এজন্যেই অনেক উইকেট পেতো। এ অবস্থায় প্রথম বোলার যেন দুঃখিত না হয়। কারণ স্কোর বোর্ডে তার কৃতিত্বটা লেখা না হলেও আসলে প্রত্যেকটি আউটের পিছনেই

তা'র হাত আছে। সর্বদাই যেন মনে থাকে, ক্রিকেটে দলের স্বার্থই হলো সবার উপরে। বিপক্ষদলের ব্যাটসম্যানকে আউট করাটাই বড় কথা, কে আউট করেছে সেটা নয়।

দুজনই সমান মারাত্মক বোলার হলে তো আর কথা নাই। অস্ট্রেলিয়ার পুরানো যুগের ওরিলী ও গ্রিমেট এবং হালে লিণ্ডওয়াল ও মিলার ঐ ধরনের জুটি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রামাধিন-ভ্যালেণ্টাইন এবং আমাদের দেশে গুপ্তে-গোলাম আহাম্মদ জুটিকেও ঐ শ্রেণীতে ধরা যায়।

বোলারের একটা লক্ষ্য ব্যাটসম্যানকে রান তুলতে না দেওয়া। কিন্তু ব্যাটসম্যানকে একটা বিশেষ ফাঁদে আউট করার মতলবে বোলার অনেক সময় ইচ্ছে করেই কিছু রান করতে দেয়।

এক জাতের ব্যাটসম্যান আছে যারা হুক স্ট্রোকটা খুব পছন্দ করে, কিন্তু অনেক সময়ই বলটাকে উঁচু দিয়ে লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠায়। লং লেগে একজন ফিল্ডার রেখে ফাস্ট বোলার ইচ্ছে করেই সে-ব্যাটসম্যানকে কয়েকটা লং হপ দেয় যাতে ব্যাটসম্যান হুক করে ঐ ফিল্ডারের হাতে ক্যাচ তোলে। অবশ্য আউট হওয়ার আগে ঐ স্ট্রোকে ব্যাটসম্যান হয়তো বেশ কয়েকটা বাউণ্ডারীও করে নেবে। পুরানো দিনে ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান সাটক্লিফকে অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলারেরা এই কায়দায় অনেক বার আউট করেছে, যদিও তাতে তা'রা সাটক্লিফকে আবার অনেক রান তোলারও সুযোগ দিয়েছে।

ঠিক একই মতলবে স্লো বোলার ইচ্ছে করে দেয় ফুল টস। সারে কাউন্টির প্রসিদ্ধ ক্যাপ্টেন পি. জি. ফেণ্ডার ফুল টস দিয়ে

ডিপ স্কোয়ার লেগের হাতে অনেক ব্যাটসম্যানকে কট আউট করতেন। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত বোলার আর্থার মেইলীও ইচ্ছে করে' ফুল টস দিয়ে অনেক উইকেট পেতেন। অবশ্য দুজনেই এ-ফন্দিতে আউট করতে গিয়ে অনেক রানও দিতে বাধ্য হয়েছেন। এ-ভাবে আউট করাকে ইংরেজীতে বলে বাইং উইকেটস অর্থাৎ রানের দামে উইকেট কেনা।

একজন রাইট হ্যাণ্ডার অর্থাৎ ডান হাতে খেলে এমন ব্যাটসম্যান ও একজন বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানের জুটি যখন ব্যাট করে, তখন যদি ঠিক একই ধরনের বোলার একজন ডান হাতে বল দেয় ও অন্যজন বাঁ হাতে, তবে বোলারদের চেষ্টা করতে হবে যাতে রাইট হ্যাণ্ডার ব্যাটসম্যান বাঁ-হাতে বলের মুখেই বেশী পড়ে। কারণ বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ডান হাতের বল, আর স্বাভাবিক ব্যাটসম্যান বাঁ-হাতের বল খেলতে অসুবিধায় পড়ে। দুজন বোলারই যখন ডান হাতে বল দেয়, তখন বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানকে অফ স্পিনার ও রাইট হ্যাণ্ডারকে লেগ স্পিনার বেশী বল দিতে চেষ্টা করবে।

বোলারকে সাহায্য করার জন্যে যে মাঠে দশ জন ফিল্ডার আছে, সে-কথা অনেক তরুণ বোলার ভুলে যায়। বলের ঘায়ে বেল উড়িয়ে-নেওয়া বা স্টাম্প উপড়ে ফেলা দেখতে খুবই মজার। কিন্তু স্কুলের ম্যাচ, ক্লাবের ম্যাচ ছাড়া বড় প্রতিযোগিতায়, কিম্বা টেস্ট ম্যাচে তা' অনেক ঘটে না। ফিল্ডারদের সহযোগিতা ছাড়া বোলার সাধারণতঃ বেশী উইকেট পায় না। কাজেই বোলারের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্যাপ্টেন যে-ভাবে ফিল্ড সাজায়,

বোলার যেন সে-অনুযায়ী বল দেয়। অফ স্পিনের ফিল্ড সাজিয়ে লেগ স্পিন বল দিলে ফিল্ডাররা তো ক্যাচ লুফতে বা রান ঠেকাতে পারে না। মনে রেখো, এলেক বেডসারের বল ও লেন হাটনের ফিল্ডিং-এর যোগাযোগে সার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের মতো ব্যাটসম্যানও পর পর তিনটি টেস্টে একই ভাবে আউট হয়েছেন।

ব্যাটের খুব কাছে ফিল্ডার রাখা একটা লাগসই কৌশল। তাতে ব্যাটসম্যানের একাগ্রতা নষ্ট হয়, সে ক্যাচ তুলে আউট হওয়ার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে খেলে। ফলে আরও তাড়াতাড়ি আউট হয়। বিল ওরিলী ঐ কৌশলে অনেক উইকেট পেয়েছেন। কিন্তু যে সব বোলারের য়্যাকিউরেসী নিখুঁত নয়, তা'রা ব্যাটের অত কাছে ফিল্ডার রাখতে পারেন না। কারণ বলের লেংথ ও ডিরেকশান ঠিক না হলে ঐ ফিল্ডার দুজন সাংঘাতিক জখম হওয়ার ভয় থাকে।

ফিল্ডসম্যান ক্যাচ ফেলে দিলে বোলারের ক্ষতি। কারণ তা'র একটা উইকেট পাওয়া ভেস্তে যায়। সুতরাং তাতে বোলার দুঃখিত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যেন ঐ ফিল্ডারকে গাল মন্দ না করে। ক্যাচ যে ফেলে দেয়, সে নিজেই তো লজ্জায় মরে থাকে।

উইকেট কীপার বোলারের সব চেয়ে বড় বন্ধু। সে যে উইকেটের পিছনে ক্যাচ লুফে ও স্টাম্পড করে' বোলারকে সাহায্য করে তাই নয়, কোন ব্যাটসম্যানের কোথায় দুর্বলতা, কী মুদ্রাদোষ তাও বোলারকে জানিয়ে দিতে পারে।

বোলার তা'র বল দেওয়ার বিশেষ ফন্দিটা উইকেট কীপারকে জানিয়ে রাখবে। ব্যাটসম্যানকে অপ্রস্তুত করতে ফাস্ট বোলার হঠাৎ তা'র একটা বল আরও বেশী ফাস্ট দেয়। স্লো বোলার ব্যাটসম্যানকে পপিং ক্রীজের বাইরে টেনে আনতে হঠাৎ বলের ফ্লাইট বদল করে। কিন্তু উইকেট কীপার যাতে তৈরী থাকতে পারে, সেজন্যে বোলার ঐ ধরনের বল দেওয়ার আগে ইসারায় খবর দেয়। ইসারাটা অবশ্য খুবই গোপনীয়, তা'রা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না। হয় তো বোলার সার্টের কলারটা একবার ছুঁয়েছে, কিম্বা কপালের উপর থেকে চুল সরিয়েছে, নয়তো বাঁ হাতের আস্তিনটা বেশী গুটিয়েছে। এতই সাধারণ ঘটনা যে, মাঠে অন্য আর কেউ খেয়ালও করেনি। কিন্তু উইকেট কীপারের কাছে সেটুকুই বিনা তারে টেলীগ্রাফ। সে বুঝে নিয়েছে, এবার কী ধরনের বল আসবে।

"নো-বল" দেওয়া বোলারের পক্ষে একটা মস্ত ত্রুটি। নো-বল-এ একমাত্র রান আউট ছাড়া অন্য কোনো আউট নেই। তাই ব্যাটসম্যান প্রায়ই বেপরোয়া ব্যাট চালায়। কখন চার, কখনও বা ছয় রান করে। সাধারণতঃ ফাস্ট ও ফাস্ট মিডিয়াম বোলারদেরই নো-বল বেশী হয়।

মোটামুটি দু' কারণে নো-বল হয়। কাঁধের কাছ থেকে বাহু সমেত পুরো ডান হাতের একটানা গতির সঙ্গে বল দিতে হয়, ঢিল ছোঁড়ার মতো শুধু কনুই-এর কাছ থেকে জোর দিয়ে আচমকা ছুঁড়লে তা' হবে নো-বল। এ-ধরনের নো-বল এড়াবার একটা সহজ উপায় হলো বল দেওয়ার সময় হাতকে কান ঘেঁষে

যতটা সম্ভব উঁচুতে তোলা। যারা একটু নীচু হাতে বল দেয় তাদেরই ডেলিভারী ঢিল ছোঁড়ার মতো—ইংরেজীতে যাকে বলে থ্রো—হওয়ার সম্ভাবনা। অস্ট্রেলিয়ার এখনকার ফাস্ট বোলার লিণ্ডওয়ালের ডেলিভারী সম্পর্কে ঠিক এই কারণেই অনেকের সন্দেহ ছিল। শেষটায় সিনেমার ছবি তুলে বিশেষজ্ঞরা তা' পরীক্ষা পর্যন্ত করেছেন। পরীক্ষায় অবশ্য লিণ্ড-ওয়ালের বল শুদ্ধ গণ্য হয়েছে। কোনো কোনো ক্রিকেট সমালোচক মনে করেন, বাংলা দেশের টেস্ট বোলার এন. চৌধুরীর বল বেশীর ভাগই ঐ রকম থ্রো—সুতরাং নো-বল।

২৭ নং ছবি
নো-বল। পিছনের পা রিটার্ন ক্রীজের উপরে আছে, ভিতরে নয়।

নো-বলের দ্বিতীয় কারণ হলো ডেলি-ভারীর সময় পিছনের পা বোলিং ক্রীজের বাইরে বা উপরে টেনে আনা। সাধারণতঃ এ ধরনের নো-বলই বেশী হয় এবং হয় অশুদ্ধ রান-আপের দোষে। বোলার যদি প্রত্যেকবার
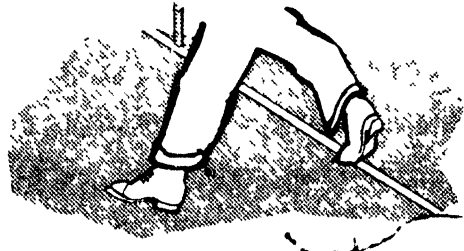
২৮ নং ছবি
নো-বল। পিছনের পা রয়েছে বোলিং ক্রীজের উপরে, ভিতরে নয়।

একই জায়গা থেকে রান-আপ শুরু করে এবং ঠিকই এক

২৯ নং ছবি

ঠিক বল। পিছনের পা রিটার্ন ক্রীজের উপরে আছে বটে, কিন্তু সামনের পা বোলিং ক্রীজের ভিতরে রয়েছে।

মাপের পা ফেলে বোলিং ক্রীজে আসে, তবে নো-বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। বড় বড় ম্যাচ খেলার শেষে উইকেটের কাছে গেলে দেখতে পাবে, একটা জায়গায় ঘাসের উপর খুব স্পষ্ট দাগ হয়ে আছে। বোলার প্রত্যেকবার ঠিক ঐ জায়গা থেকে রান-আপ শুরু করেছে, তাই তার পায়ের চাপে ঐখানে ঘাস বসে গিয়েছে। সাবধানতার দিক দিয়ে পিছনের পা বোলিং ক্রীজের একটু বেশী ভিতরে নামানো নিরাপদ।

৩০ নং ছবি

ঠিক বল। পিছনের পা মাটি থেকে উঠে গেছে বটে, কিন্তু বোলিং ক্রীজ ও রিটার্ন ক্রীজের মধ্যে আছে।

তাড়াতাড়ি বল ছুঁড়তে গিয়ে ফিল্ডার অনেক সময় স্টাম্প ঠিক তাক করতে পারে না, উইকেট কীপার সে-সব বল ধরে' ব্যাটসম্যানকে রান আউট করে। উল্টো দিকের উইকেটে বোলার উইকেট কীপারের

মতো স্টাম্প কভার করবে অর্থাৎ পাহারায় দাঁড়াবে, যাতে সেখানে ঐ রকম বল ধরে' সে রান আউট করতে পারে। ফিল্ডিং-এ একে বলে,—ব্যাকিং আপ।

বলের পালিশ বজায় রাখতে বোলার বা ফিল্ডার বলটা তাদের সার্টের বা ট্রাউসারসের গায়ে ঘষতে পারে। ফাস্ট ও সুইং বোলারদের পক্ষে তা' দরকারী। আলাদা পশমী কাপড়ের টুকরো বা ন্যাকড়া, এমন কি পকেটের রুমাল দিয়ে ঘষা চলবে না কিন্তু। অবশ্য মাঠ খুব বেশী ভিজে থাকলে করাতের গুঁড়ো ও তোয়ালে দিয়ে বল পোঁছা খেলার আইনে বারণ নয়।

স্লো বোলারেরা বলের উপরটা খসখসে হ'লে আঙ্গুল দিয়ে ধরতে সুবিধা পায়, বেশী পরিমাণে স্পিনও দিতে পারে। খেলার গোড়াতেই যদি পিচ ভালো স্পিন নেয় তা'হলে ক্যাপ্টেন বলের পালিশ উঠে যাওয়ার অপেক্ষায় সময় নষ্ট করতে চায় না। স্লো বোলারদের সুবিধার জন্যে ঘাসের উপরে ঘষে' বলের পালিশ তুলে ফেলে। এটুকু খেলার নিয়মে আটকায় না। কিন্তু বল দিতে সুবিধার জন্যে বোলার অন্য আর কোনো রকম কৃত্রিম উপায় নিলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। আঙ্গুলে স্টিকিং প্ল্যাস্টার বা ফিতে জড়িয়ে নিলে স্পিন দিতে খুব সুবিধা হয়। কিন্তু তা' নিয়মে বাধে।

কোনো কোনো বোলারের অভ্যাস রান-আপ শুরু করার আগে ডান হাতের আঙ্গুল মুখের থুথুতে একটু ভিজিয়ে নেওয়া। সেটা খেলার আইনে আটকায় কি ? না, একমাত্র সাউথ আফ্রিকা ছাড়া অন্য জায়গায় তাতে নিষেধ নেই। বছর পাঁচেক আগে

এম. সি. সি. ও কিম্বারলীর ম্যাচে ইংলণ্ডের স্পিন বোলার ডগলাস রাইটকে নিয়ে খুব তর্ক বেধেছিল। রাইটের ছিল ঐ অভ্যাস। আম্পায়ার আপত্তি করলেন। শেষটায় দু'দলের ক্যাপ্টেন ও আম্পায়ার কথাবার্তা বলে তর্কের নিষ্পত্তি করলেন। রাইটকে তার অভ্যাস অনুযায়ী বল দিতে দেওয়া হলো। তবে খেলার আইন যা-ই হোক, ঐ অভ্যাসটা স্বাস্থ্যের দিক থেকে খারাপ, কাজেই কোনো বোলারই যেন তা' না করে।

স্বাস্থ্যের কথায় তরুণ বোলারদের একটা বিষয় মনে করিয়ে দিচ্ছি। বোলারের পক্ষে দরকারী য়্যাপ্টিচিউড আর প্র্যাকটিস তা' অনেকবার বলেছি। কিন্তু এ দুই-এর উপরে চাই স্বাস্থ্য। দলীপ সিংজীর মতো চৌকশ ক্রিকেটারও শুধু খারাপ স্বাস্থ্যের জন্যেই অকালে খেলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। স্বাস্থ্য ভালো না হলে ব্যাটিং, ফিল্ডিং কোনোটাই ভালো পারবে না, বোলিং তো নয়ই। স্ব্যাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে চাই নিয়মিত খাওয়া, নিয়মিত ঘুম আর ব্যায়াম। লেন হাটন এখনও প্রত্যহ সকালে দৌড়ে শরীর সুস্থ রাখেন। পিটার মে নিয়মিত স্কিপিং করেন।

বোলার যেন কখনও বোলিং-এ এতটুকু ঢিলেমি না দেখায়। অনেক সময় খেলার গোড়াতে বোলার খুব সহজেই কয়েকটা উইকেট পেয়ে মনে ভাবে,—"ব্যস্, খেলা তো জিতেই গেছি; এখন আর বেশী পরিশ্রম না করলেও চলবে।" তা' হলেই কিন্তু খেলায় হেরে যাওয়ার আশঙ্কা। ক্রিকেট বড়ই অনিশ্চিত খেলা। কখন কী ভাবে যে খেলার মোড় ঘুরে যায়, তা' কেউ বলতে পারে না। তুখড় ব্যাটসম্যানেরা হয়তো শূন্য বা তিন চার

রান করে আউট হয়ে গেল। অথচ একজন কাঁচা ব্যাটসম্যান, যে বরাবর শূন্য করে, সে এসে হঠাৎ এমন হাত জমিয়ে বসল যে, নামজাদা বোলাররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল দিয়ে তাকে আউট করতে পারছে না। বিলাতে ১৯৪৬ সালে সারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের শেষ দুজন ব্যাটসম্যান সুঁটে ব্যানার্জী ও সারভাতে দশম উইকেট জুটিতে ২৪৯ রান করেছিলেন। কাজেই খেলা একেবারে না জেতা পর্যন্ত বোলার বা ফিল্ডার কেউ যেন তাদের মনোযোগ বা চেষ্টা এক তিলও না কমায়।

বোলার সম্পর্কে সব শেষ কথা আর সব চেয়ে দরকারী হলো তার স্বাভাবিক কৌশল। অর্থাৎ যে-ভাবে বল দিয়ে সে সব চেয়ে ভালো ফল পায় সেটাই হলো তার পক্ষে বল দেওয়ার সব চেয়ে ভালো কায়দা। এর আগে বল দেওয়ার যে নানা রকম সংকেত বলা হয়েছে সেগুলি বেশীর ভাগ অর্থাৎ শতকরা আটানব্বুই জন বোলারের পক্ষেই খাটবে। কিন্তু বাকী দু' জন যদি দেখে যে, কোনো একটা বিষয়, যেমন গ্রিপ, রান-আপ বা ডেলিভারী সে অন্যভাবে বেশী ভালো করতে পারছে, তবে সে যেন বই-এর নির্দেশের সঙ্গে হুবহু মিলের খাতিরে তার নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গিটা ছেড়ে না দেয়।

এ পর্যন্ত পৃথিবীতে কয়েকজন বড় বড় বোলার হয়েছেন, যাঁদের বল দেওয়ার ভঙ্গি কোনো কোনো বিষয়ে সাধারণ নিয়মের বাইরে। আমাদের অমরনাথ উল্টো পায়ে এবং নিউজিল্যাণ্ডের ক্রেসওয়েল ফুল চেস্টেড বল দেন। বিলাতের রাইট রান-আপের মাঝে লাফিয়ে ওঠেন, অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক ইভারসন বুড়ো

আঙ্গুল আর [illegible] গ্রিপ করেন, রে. লিণ্ডওয়াল নীচু হাতে বল ছোঁড়েন। এরা সবাই ব্যতিক্রম। কিন্তু একথাও যেন কেউ ভেবো না যে নিয়ম না মানলেই তাঁদের মতো নামজাদা বোলার হওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কোনো পাশ না করেও ছিলেন পৃথিবীর সেরা কবি। তাই বলে কোনো পাশ না করলেই তাঁর মতো কবি হওয়া যায় ভেবে স্কুলের ছেলেরা যদি লেখাপড়া ছেড়ে দেয় তবে তাদের কী দশা হবে, বলো তো ?

কেউ কেউ আবার ভাবে সবাই নিয়ম মতো ভঙ্গিতে বল দিলে সব বোলারই বুঝি এক ধরনের বল দেবে। কলে তৈরী খেলনার মতো কারো সঙ্গে কারো কোনো তফাৎ থাকবে না। সে-ভয় একেবারেই মিথ্যে। আমরা যখন লিখতে শিখি তখন সবাই একই নিয়মে একই অক্ষর, একই ফলা-বানান লিখি। কিন্তু তাই বলে বড় হয়ে একজনের লেখার সঙ্গে আর একজনের লেখা হুবহু মেলে কি ? হাতের লেখার মতো ক্রিকেটে খেলার ধরনও প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই নিজস্ব। যদিও মাঝে মাঝে কারো খেলায় হয়তো অন্য কোনো বিখ্যাত খেলোয়াড়ের কিছুটা ছাপ থাকে। রণজিৎ সিংজীর সঙ্গে দলীপের ক্রশ লেগ স্টান্সের মিল ছিল, পাতৌদির ড্রাইভে ভিক্টর ট্রাম্পারের ছাপ ছিল, টম গ্রেভনীর স্ট্রোকে ওয়েলী হ্যামণ্ডের এবং বেডসারের ভঙ্গিতে য়্যালান পিচের ছাঁদ আছে। ঠিক যেমন আজকাল বাংলা দেশে অনেক সাহিত্যিকের হাতের লেখায় রবি ঠাকুরের আদল আসে।

ফিল্ডিং

ক্রিকেটে হার জিত অনেকখানি নির্ভর করে ফিল্ডিং-এর উপরে। সাধারণতঃ অর্ধেক ব্যাটসম্যান বিদায় হয় ক্যাচ তুলে। কট, স্টাম্পড ও রান আউট মিলিয়ে শতকরা আটান্ন জন ব্যাটসম্যানই আউট হয় ফিল্ডারদের হাতে, সে-কথা আগেই বলেছি। সুতরাং দলে চৌকশ ব্যাটসম্যান ও বোলার থাকা সত্বেও ভালো ফিল্ডারের অভাবে টীম হেরে যেতে পারে। এর জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হচ্ছে ভারতীয় টেস্ট টীম।

কুড়ি বছরেরও উপরে ভারতবর্ষ সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলছে। অমর সিং, নিসার ও মানকাদের মতো বোলার, এবং নাইডু, অমরনাথ, মুস্তাক, মার্চেণ্ট ও হাজারের মতো ব্যাটসম্যান —যারা পৃথিবীর যে-কোনো সেরা ক্রিকেটারের সমকক্ষ— খেলেছেন ভারতীয় টীমে। তা' সত্বেও এ পর্যন্ত মাত্র তিনটি সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ জিতেছে। তারও আবার দুটো পাকিস্তানের সঙ্গে যারা সবে মাত্র সরকারী টেস্ট খেলার যোগ্যতা পেয়েছে। বাকী একটা ইংলণ্ডের দুর্বল টীমের সঙ্গে —যে-টীমে না ছিল হাটন, না ছিল কম্পটন, না ছিল বেডসার বা এভান্স। ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ডের পুরো টীম এবং অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা টেস্ট ম্যাচেও জিততে পারে নি, তার একটা বড় কারণ হলো ফিল্ডিং-এ ত্রুটি।

ভেবে দেখলে, একটা ক্যাচ ফেলে দেওয়ার মানে হলো একজন ব্যাটসম্যানকে একবারেই দু' ইনিংস খেলতে দেওয়া। একটা রান বাঁচানো মানেই তো হলো নিজেদের এক রান বাড়ানো। তাই নয় কি?

ফিল্ডিং-এ অস্ট্রেলিয়ার বরাবরই খুব নাম আছে। অনেক বারই ব্যাটিং ও বোলিং-এ তুলনায় অনেকটা দুর্বল হয়েও শুধু নিখুঁত ফিল্ডিং-এর জোরেই সে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়েছে। মোটামুটি একই দল ফিল্ডিং-এ উন্নতি করে' কী ভাবে খেলার চেহারা পাল্টে দিতে পারে তারও দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতীয় দল। ১৯৫১ সালে যে টীম ইংলণ্ডে শোচনীয় ভাবে হেরেছে, সামান্য কিছু অদল বদল করে' সে টীমই পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভালো ফিল্ডিং-এর জন্য প্রশংসা পেয়েছে।

যে-কেউ নামজাদা ক্রিকেটার হতে চায়—তা' সে ব্যাটসম্যান হিসাবেই হোক, কি বোলার হিসাবেই হোক—সে যেন মনে রাখে যে, ফিল্ডিং-এ পাকা না হলে কোনো কালেই সে বড় খেলোয়াড় বলে গণ্য হবে না। টেস্ট টীম বাছাই-এর সময় শুধু ভালো ফিল্ডিং-এর জন্যেই একটু কম চৌকশ ব্যাটসম্যান বা বোলার দলে জায়গা পেয়েছে, এমন ঝুড়ি ঝুড়ি দৃষ্টান্ত আছে। ভারতবর্ষে আজকাল হিমু অধিকারী, পি. রায়, গদকারী, ডি. কে. গায়কোয়াদ ভালো ফিল্ডিং-এর জন্যে প্রসিদ্ধ।

ফিল্ডিংকে মোটামুটি দু' ভাগে আলাদা করা যেতে পারে। এক,—মাটিতে গড়িয়ে যে-বল আসছে তা' আটকানো। দুই ক্যাচ লোফা। প্রথমটার উদ্দেশ্য হলো রান বাঁচানো, দ্বিতীয়টার লক্ষ্য আউট করা। অবশ্য অনেক সময় রান বাঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই

আউট করারও সুযোগ মেলে। তখন ফিল্ডার বলটা কুড়িয়ে সেই মুহূর্তেই উইকেট তাক করে' ছোঁড়ে। ক্যাচ লোফাকে এক কথায় বলে ফিল্ডিং ইন দি এয়ার (fielding in the air)। আর মাটিতে বল আটকানো ও উইকেটে বল ছোঁড়াকে বলে গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং (ground fielding)। বল আটকাতে যত তাড়া-তাড়ি সম্ভব বলের দিকে ছুটতে হয়—এ তো সবাই জানে। বলটা ব্যাটে লাগা মাত্রই যদি ছুটতে শুরু করা যায়, তবেই নিমেষের মধ্যে বলের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। তার জন্যে চাই এমন ভাবে দাঁড়ানো যাতে শরীর একটুও আড়ষ্ট না ঠেকে। ডাইনে, বাঁয়ে সামনে যে-দিকেই ছুটতে, ঝুঁকতে বা হাত বাড়াতে হোক না কেন খুব স্বচ্ছন্দে এবং এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে তা' করা চাই। শুনতে যতটা কঠিন মনে হচ্ছে, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তত শক্ত নয়,—অবশ্য যদি ঠিক কায়দাগুলি জানা থাকে।

৩১ নং ছবি।
কাছের ফিল্ডারের সর্বদা সজাগ ভঙ্গি। ছু' পায়ে সমান ভর। পা ছুটি ছড়ানো, কিন্তু খুব দূরে নয়। হাঁটু ও কোমর নীচু। দৃষ্টি ব্যাটের দিকে।

দু' পায়ে সমান ভর দিয়ে কোমর ও হাঁটুর কাছে সামান্য নীচু হয়ে, হাত দুটি আলগোছে শরীরের সামনে রেখে দাঁড়াবে, অনেকটা একত্রিশ নম্বর ছবির মতো। ফিল্ডারের পক্ষেও সব চেয়ে বেশী দরকার কন্‌সেন-ট্রেশন—অর্থাৎ একাগ্রতা। প্রত্যেক ফিল্ডারই এমন ভাবে তৈরী থাকবে যেন প্রত্যেকটি বল তা'রই কাছে আসছে।

৩২ নং ছবি। রান-বাঁচানো ফিল্ডিং। চোখ বলের উপরে, হাঁটু বেঁকেছে, পা দুটি ইংরেজী 'ভি' অক্ষরের মতো। শরীর বলের পিছনে।

গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং-এ কী ভাবে বল আটকাতে হবে পাশের ছবিতে তা' দেখানো হয়েছে। বলটা যে লাইনে আসছে ছুটে তার কাছে গিয়ে দু' হাত পেতে সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করতে হবে। অর্থাৎ শরীর থাকবে বলের ঠিক পিছনে। পায়ের টো আলাদা কিন্তু গোড়ালী একত্র করে পা দুটি রাখবে ইংরেজী 'ভি' (v) অক্ষরের মতো। মাথা থাকবে হাঁটুর এক ফুট উঁচুতে, চোখ বলের উপর। যতক্ষণ না বলটা একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরেছো, ততক্ষণ দৃষ্টি যেন এক চুল নড় চড় না হয়। অনেক ফিল্ডার বলটা হাতের কাছাকাছি গড়িয়ে এলেই বল ছুঁড়ে রান আউট করার আগ্রহে উইকেট বা ব্যাটসম্যানের দিকে তাকায়। আর অমনি বলটা ফস্কে যায়।

তাড়াতাড়ি বলের কাছে পৌঁছতে হলে আগে থাকতেই আঁচ করা দরকার বলটা কোথায় আসছে। ইংরেজীতে একে বলে, য়্যান্টিসিপেশান। সেজন্যে ব্যাটের উপরে কড়া নজর রাখতে হয়। শ্লিপের ফিল্ডার নজর রাখবে বলের উপর। বোলারের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ব্যাটে লেগে বলটা কোথায় যাচ্ছে সারাক্ষণ তার দিকে লক্ষ্য না রাখলে শ্লিপ ক্যাচ লুফতে পারবে না।

৩৩ নং ছবি।
আউট করার ফিল্ডিং।
ডান পায়ে শরীরের ভর দিয়ে বল কুড়োচ্ছে।
বাঁ পা কিছুটা দূরে।

বল থামানোটা ফিল্ডিং-এর প্রথম ধাপ। তার পরে চাই তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে উইকেটে লাগানো। এমন ভাবে বলটাকে ধরা চাই যাতে এক সেকেণ্ডও সময় নষ্ট না করে' বলটাকে ছুঁড়তে পারা যায়। বল ধরা আর ছোঁড়া যেন প্রায় একই সঙ্গে হয়। প্রথমে শরীরটাকে বলের পিছনে নিয়ে এস, ডান পা থেকে বাঁ পা যেন দূরে থাকে। হাঁটু ও কোমর বাঁকিয়ে নীচু করো। ডান পায়ে ভর দিয়ে দু' হাতের মধ্যে বলটাকে আসতে দাও। বলটা হাতের মুঠোয় এলে, যে-দিকে বল ছুঁড়বে সে-দিকে বাঁ হাত সোজা বাড়িয়ে তাক করো। ডান হাত কনুইর কাছে বাঁকবে, শরীরের ভর থাকবে ডান পায়ে। বাঁ কাঁধ

. আর দৃষ্টি থাকবে নিশানার অর্থাৎ উইকেটের দিকে। যে-মুহূর্তে

৩৪ নং ছবি।
আউট করার ফিল্ডিং। বল উইকেটে ছুঁড়ছে, বাঁ হাত ও চোখের দৃষ্টি নিশানার দিকে, কাঁধ উইকেট-মুখো।

বলটা ছুঁড়ছো সেই মুহূর্তে বুক হবে উইকেট-মুখো। তখন শরীরের খুঁটি হবে বাঁ পা।

বল দেওয়ার মতো বল ছুঁড়তেও ফলো-থ্রু আছে। ফলো-থ্রু'তে শরীরের ভর চলে যাবে বাঁ পায়ে, শরীর সামনে ঝুঁকে পড়বে। বল ধরা থেকে এই ফলো থ্রু'র ভঙ্গি পর পর তেত্রিশ, চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ নম্বর ছবিতে এঁকে দেখানো হয়েছে।

৩৫ নং ছবি।
বল ছোঁড়ার ফলো-থ্রু। শরীরের ভর এবার চলে গেছে বাঁ পায়ে।

বল কুড়িয়ে উইকেট কীপার বা বোলারের কাছে ছুঁড়ে দেওয়াকে ইংরেজীতে বলে রিটার্ন (return)। রিটার্নে বলটা সব সময়েই "ফুল টস" ছুঁড়তে হয়—মাটি দিয়ে গড়িয়ে নয়। বোলার বা উইকেট

কীপার যখন উইকেট আগলে দাঁড়ায় তখন কাছের ফিল্ডারদের উচিত উইকেট কীপার ও বোলারের দশ বারো গজ পিছনে গিয়ে দাঁড়ানো। যদি কোনো কারণে বলটা উইকেট কীপার বা বোলার না ধরতে পারে, তবে ঐ ফিল্ডারেরা তা' আটকাবে। এ-ভাবে "ব্যাক-আপ" না করলে অনেক সময় ওভার থ্রো অর্থাৎ বে-হিসেবী বল ছোঁড়ার ফলে এক রানের জায়গায় অনর্থক চার পাঁচ রান আক্কেল সেলামী দিতে হয়। আউটের সম্ভাবনা না থাকলে সাধারণতঃ উইকেট কীপারের কাছেই বল ছুঁড়ে দেওয়া ভালো। অন্য যে-কোনো ফিল্ডারের চাইতে বল ধরতে সে বেশী ওস্তাদ।

৩৬ নং ছবি।
ক্যাচ লোফা। চোখের সামনে উঁচুতে বলটা ধরাব চেষ্টা। দু' পায়ে সমান ভর। দৃষ্টি বলের উপর।

ডিপ ফিল্ডে যারা দাঁড়াবে, তা'রা বোলারের হাত থেকে বলটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটু সামনের দিকে এগোবে। বাউণ্ডারী লাইন থেকে কিছুটা ভিতরে দাঁড়ানো ভালো। কারণ তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে আসা যায়। পিছিয়ে যাওয়াটা সব সময়েই শক্ত।

অনেক ফিল্ডার আছে, যারা বেশ খানিকটা দূর থেকেও

চোখের পলকে বল কুড়িয়ে উইকেটে লাগাতে পারে। তারা দলের শক্তি বাড়ায়। রান আউট করা ছাড়াও তা'দের আর একটা গুণ এই যে, তা'রা ব্যাটম্যানকে সর্বদা সশঙ্কিত রাখে। যখন এক রান হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখনও ব্যাটসম্যান তা' নিতে চায় না, পাছে আউট হয়ে যায়।

ফিল্ডিং-এ একটা কথা মনে রাখা দরকার। ব্যাটসম্যান আউট হোক কি না হোক, তার রান এক, কি, এক শ', ফিল্ডারদের সর্বদাই খুব সজাগ থাকতে হবে। বল কুড়োতে বা ছুঁড়তে একটুও ঢিলে হলে চলবে না। ফিল্ডিং-এ ঢিলেমি আর তৎপরতা দুই ই অত্যন্ত ছোঁয়াচে। মাঠে একজন যখন খুব চটপটে ফিল্ডিং করে, তখন অন্য আর দশ জনের ফিল্ডিং-এ উন্নতি দেখা দেয়, এবং একজন ভুল ত্রুটি করতে থাকলে অন্য আর দশ জনকেও ঐ রোগে পেয়ে বসে।
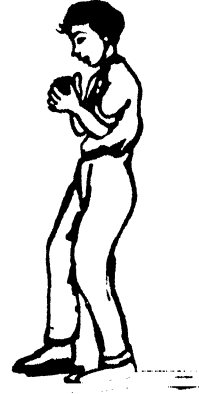
৩৭ নং ছবি। ক্যাচ লোফা। হাত দুটি 'গিভ'-এর ফলে নীচে নেমেছে, চোখ এখনও বলের উপর।

ক্যাচ লোফার মোটামুটি কয়েকটা কৌশল আছে। বেশীর ভাগ ক্যাচই ফস্কে যায় ভুল জায়গায় দাঁড়ানো বা শরীরের ভারসাম্য অর্থাৎ ব্যালেন্স ঠিক না থাকার ফলে। প্রথমে বলটা যেখানে আসছে সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। এবার দু' পায়ে সমান ভর দিয়ে দাঁড়াও। মাথা স্থির ও চক্ষু বলের উপর রাখো। পাশের পৃষ্ঠায় ছত্রিশ নম্বর ছবিটির মতো। যেখানে দু' হাতে ধরতে পারো,

সেখানে কখনও এক হাত বাড়াবে না। দু' হাতের আঙ্গুল মেলে ধ'রে বলের জন্যে বাসা তৈরী করো। নতুন খেলোয়াড়েরা আঙ্গুলের ডগা খাড়া আকাশের দিকে মেলে ধরে। তাতে আঙ্গুল জখম হয়, ক্যাচও মাটিতে পড়ে যায়। ছত্রিশ নম্বর ছবি দেখলে বুঝতে পারবে, আঙ্গুল কী ভাবে মেলবে। সব সময় বলটা চোখের সমান উঁচুতে ধরতে চেষ্টা করবে। বল একবার চোখের নীচে নেমে গেলে তার উপরে দৃষ্টি রাখা কঠিন। বলটা হাতের মুঠিতে এলে মুঠো-করা হাত দুটিকে নীচের দিকে টেনে নামাবে ঠিক সাঁইত্রিশ নম্বর ছবির মতো। বলের গতির সঙ্গে এই হাত টেনে নেওয়াকে ইংরেজীতে বলে "গিভ" (give)। ক্যাচ লোফার পক্ষে এই কৌশলটা খুব দরকারী।

একটা শক্ত দেয়ালের গায়ে বল ছুঁড়লে বলটা লাফিয়ে পিছনে ফিরে আসে। অথচ একটা ঝোলানো পর্দার গায়ে বল ছুঁড়লে পর্দাটা সামান্য একটু পিছনে সরে যায়, আর বলটা অমনি সেখানে মাটিতে পড়ে, লাফিয়ে ফিরে আসে না। "গিভে"র মূল কথাটাও হলো এই। বলটা যখন হাতের মুঠিতে এসেছে, তখন হাত শক্ত করে নিশ্চল রাখলে হাতের তেলো দেয়ালের মতো ঠেকবে; বলটা ঠিকরে' মাটিতে পড়ে যাবে। বলের যে-দিকে গতি, সে-দিকে হাত দুটি একটু টেনে আনলে হাতের তেলো পর্দার মতো কাজ করবে, বলটা ছিটকে মুঠির বাইরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। এই 'গিভ' কৌশলটা যার খুব ভালো রপ্ত হয়েছে, সে বলটাকে আঙ্গুল দিয়ে আঁকড়ে না ধরেও ক্যাচ লুফতে পারে। আমার

চেনা একজন খেলোয়াড় তাঁ'র ব্যাটের বুক দিয়ে ক্যাচ লুফে' ম্যাজিক দেখাতেন। শুধু 'গিভে'র কৌশলেই তা' করতেন। ব্যাটের তো আর আঙ্গুল নেই যে বল আঁকড়ে ধরবে! অবশ্য ম্যাচ খেলায় ওরকম ম্যাজিকের চেষ্টা না করাই ভালো। সেখানে ফিল্ডার যেন কোনো সময়েই 'গিভ'-এর সঙ্গে-সঙ্গে তার হাতের দশটা আঙ্গুল দিয়ে বলটা আঁকড়ে ধরতে না ভোলে।

অনেক সময় দু' তিন জন ফিল্ডার একই সঙ্গে লুফতে গিয়ে ক্যাচ নষ্ট করে। নিজেরাও ঠোকাঠুকির ফলে জখম হয়। গত বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ঠিক ঐ ভাবে হাজারে আর ডি. কে. গায়কোয়াদ একে অন্যের গায়ে ধাক্কা লাগায়। ফলে গায়কোয়াদ বেচারীকে হাত ভেঙ্গে হাসপাতালে যেতে হয়। কখনও আবার দুজন ফিল্ডারের মধ্যে কে বলটা লুফবে তা' নিয়ে ভাবনা চিন্তার ফলে ক্যাচ মাটিতে পড়ে যায়। এ-সব অবস্থায় সর্বদাই একজন ফিল্ডার ক্যাচ লোফার চেষ্টা করবে এবং সে প্রথমেই চেঁচিয়ে বলবে,—মাইন (mine)—আমার ক্যাচ!

ব্যাটিং এবং বোলিং-এর মতো ফিল্ডিংও নিখুঁত হয় শুধু ক্রমাগত প্র্যাকটিসে। স্লিপে ফিল্ডিংই সব চেয়ে শক্ত, কারণ সেখানেই বেশী আচমকা ক্যাচ ওঠে। সে-ক্যাচ লুফতে চাই চোখের খুব কড়া দৃষ্টি আর মনোযোগ। স্লিপের ক্যাচ প্র্যাকটিস করার জন্যে আজকাল বিলাতে ও অস্ট্রেলিয়ায় এক ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। বোম্বের ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া এবং বালিগঞ্জের ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবে ঐ যন্ত্রটা অনেকেই হয়তো দেখে থাকবে।

ফিল্ডসম্যানেরা সর্বদা ক্যাপ্টেনের কথা মেনে চলবে ও তাঁ'র দিকে চোখ রাখবে। ফিল্ড সাজাতে ক্যাপ্টেনকে যেন চেঁচিয়ে নির্দেশ দিতে না হয়। তাঁ'র হাতের সামান্য একটু ইসারায় যেন প্রত্যেকটি ফিল্ডার এগিয়ে বা পিছিয়ে ঠিক জায়গাটিতে দাঁড়াতে পারে।

সাধারণতঃ দলের পাকা ফিল্ডারদের কাছের ফিল্ডিং-এ যেমন—শ্লিপ, গালী, শর্ট লেগ, সিলী বা পয়েণ্টে—রাখা হয়। টেস্ট বা বড় ম্যাচে দেখা যায়, কোনো একজন ফিল্ডার বরাবর একই জায়গায় ফিল্ডিং করে। তার কারণ সে অনেক দিনের প্র্যাকটিসে ঐ বিশেষ জায়গার ফিল্ডিং-এ খুব পাকা হয়েছে শ্লিপে দলীপ সিংজী ও হ্যামণ্ড এবং কভার বা এক্সট্রা কভারে হবস ও ওয়াসব্রুকের নাম আজও কেউ ভুলতে পারে নি। কাছের ফিল্ডিং-এ ফিঙ্গলটন, গাবী য়্যালেন ও অমর সিং ঐ রকম চিরস্মরণীয়। একালে অস্ট্রেলিয়ার মিলার ও ইংলণ্ডের বিল এডরিচের শ্লিপে খুব সুনাম।

গোড়াতে কিন্তু সব ফিল্ডারকেই যে-কোনো জায়গায় ফিল্ডিং করতে শিখতে হয়। কলেজের এম. এ. পরীক্ষায় কেউ পড়ে শুধু ইংরেজী, কেউ ইতিহাস, কেউ বা বাংলা। কিন্তু স্কুলে সব ছেলেকে সব বিষয়ই শিখতে হয়। তরুণ খেলোয়াড়েরা যখন খেলা শিখছে, তখন কেউ শ্লিপে খুব পাকা হয়ে লং অন আউট ফিল্ডে একেবারে আনাড়ি হলে তার দশা হবে ক্লাশের সেই ছাত্রের মতো যে ইংরেজীতে ফার্স্ট হয়ে অঙ্কে পায় ত্রিশ।

উইকেট কীপিং

যাদের যথেষ্ট সাহস নেই, তা'রা যেন কোনো কালে উইকেট কীপার হওয়ার চেষ্টা না করে। উইকেট কীপার হাতে, বুকে, বা কপালে বলের ঘায়ে মাঝে-মাঝে জখম হবেই হবে। তা'তে যারা ভয় পাবে না বা দমে যাবে না, শুধু এমন ছেলেরাই যেন উইকেট কীপিং শিখতে যায়।

উইকেট কীপারের কাজটা খুব পরিশ্রমেরও বটে। ফিল্ডিং দলের অন্য আর সব খেলোয়াড়ের চাইতে তার খাটুনিটা বেশী। বোলারও এক ওভার বল দিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে পারে। ইনিংস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেচারী উইকেট কীপারের আর বিশ্রাম নেই। পাঠশালার পড়া ভুলে-যাওয়া দুষ্টু ছেলের মতো তা'কে হাফ-নিল-ডাউন হয়ে থাকতে হয় বেশীক্ষণ। সুতরাং তা'র শরীর মজবুত ও স্বাস্থ্য ভালো হওয়া প্রয়োজন। তা'র হাত হবে বেশ শক্ত এবং আঙ্গুলগুলি হৃষ্ট-পুষ্ট।

উইকেট কীপারের কয়েকটা সরঞ্জাম চাই। প্রথমে এক জোড়া প্যাড। আর চাই এক জোড়া গ্লাভস। গ্লাভস হলো একই সঙ্গে উইকেট কীপারের ঢাল এবং তলোয়ার। নিজের শরীরের আঘাত বাঁচাতে আর ব্যাটসম্যানকে স্টাম্পড বা ক্যাচ লুফে আউট করতে গ্লাভসই হলো তা'র হাতিয়ার। গ্লাভস জোড়া মজবুত ও হাতের ঠিক মাপসই হওয়া চাই,—খুব ঢলঢলে

বা খুব আঁট গ্লাভস পরে' উইকেট কীপিং চলে না। সার্টের নীচে গেঞ্জির মতো গ্লাভস পরার আগে দু' হাতে আরও এক জোড়া পাতলা সূতোর বা শ্যাময় চামড়ার দস্তানা পরে' নেওয়া ভালো। একে ইংরেজীতে বলে "ইনারস" (inners)। কোনো কোনো উইকেট কীপার গ্লাভস পরার আগে আঙুলে ফিতে জড়িয়ে নেয়।

উইকেট কীপার কোথায় দাঁড়াবে? স্টাম্পের পিছনে। ঠিক কথা। সে আর কে না জানে? কিন্তু কতখানি পিছনে? স্টাম্পের এক হাত পিছনে, না, দশ হাত দূরে? সেটা নির্ভর করবে কী ধরনের বল ধরতে হবে তার উপরে। ফাস্ট বল হ'লে স্টাম্প থেকে দূরে, আর স্লো বোলারের বেলায় স্টাম্পের কাছে। ফাস্ট বোলিং-এ আবার পিচের অবস্থা বুঝে দূরত্ব কম বেশী হবে। বেশী সতেজ পিচে উইকেট কীপার যতটা পিছনে দাঁড়াবে, মরা-পিচে অর্থাৎ যেখানে বলটা আস্তে হয়ে যায়, সেখানে ততটা দূরে না দাঁড়ালেও চলে। কাজেই স্কেল মেপে উইকেট কীপারের জায়গা দাগ দেওয়া চলে না। তবে মোটামুটি এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, উইকেট কীপার হয় স্টাম্পের খুব কাছে দাঁড়াবে, নয় তো দূরে। কাছেও নয়, দূরেও নয়—এমন মাঝামাঝি জায়গা নেই উইকেট কীপিং-এ।

স্টাম্পের কাছে দাঁড়ালে স্টাম্পড করার সুবিধা, আর দূরে দাঁড়ালে ক্যাচ লোফা সহজ। মাঝামাঝি দাঁড়ালে না করা যায় স্টাম্পড, না ধরা যায় ক্যাচ। মোটামুটি বলা যেতে পারে, এমন জায়গায় দাঁড়ানো ভালো যেখানে গুড-লেংথ বল পিচ খাওয়ার পরে নীচের দিকে নামতে শুরু করে।

অনেক তরুণ উইকেট কীপার ভাবে, স্টাম্প থেকে দূরে দাঁড়ানো বুঝি ভীরুতার লক্ষণ। মোটেই না। জখম হওয়ার ভয় না হয় ছেড়েই দিলেম। ফাস্ট বোলিং-এ দূরে না দাঁড়ালে খেলার দিক দিয়েও ক্ষতি। ফাস্ট বোলারেরা উইকেট পেতে বেশীর ভাগই নির্ভর করে খুট করে ব্যাটের কিনারায়-লাগা ক্যাচ লোফার উপরে। উইকেট কীপার যথেষ্ট পিছনে না থাকলে সে-ক্যাচ, বিশেষতঃ যেগুলি লেগের দিকে সেগুলি, লোফা যায় না। দু' বছর আগে ওভালের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কীপার ডন ট্যালন লিণ্ডওয়ালের বলে লেন হাটনকে যে-আশ্চর্য্যজনক ভাবে "কট বিহাইণ্ড" করেছিলেন, তা' আজও লোকে গল্প করে থাকে। বলটা হাটনের ব্যাটে লেগে প্রায় ফাইন লেগের দিকে যাচ্ছিল। মাটির ইঞ্চি খানেক উপরে থাকতে ট্যালন ঝাঁপিয়ে পড়ে তা' লুফে নেন। স্টাম্পের অনেক পিছনে না থাকলে কিছুতেই সে-ক্যাচ লোফার সাধ্য ছিল না। ফাস্ট বোলিং-এ দূরে দাঁড়াবার আরও সুবিধা এই যে, তা'তে 'বাই রান' কম হয়, ব্যাটসম্যান ফাইন লেগে গ্ল্যান্স করতে ভয় পায়, এবং উইকেট কীপার একজন অতিরিক্ত শ্লিপের কাজ করতে পারে।

'দাঁড়ানো' কথাটা কিন্তু খুব ঠিক নয়। কারণ আসলে উইকেট কীপার দাঁড়ায় না, বসে। অবশ্য পুরোপুরি বসে বললেও ভুল হবে। তা'র বসার ভঙ্গিটা আটত্রিশ নম্বর ছবিতে এঁকে দেখানো হয়েছে। এমন ভাবে বসতে হবে যাতে এতটুকু অস্বস্তি না লাগে। দু' পায়ে সমান ভর দিয়ে হাত দুটি রাখতে হবে সামনে দু' পায়ের মাঝখানে। পায়ের গোড়ালী থাকবে

আলগোছে। আঙ্গুলের পিছনটা মাটি ছুঁয়ে থাকবে, কিন্তু আঙ্গুলে শরীরের ভর পড়বে না। মাথা আর শরীর একটুও নড়বে না।

৩৮ নং ছবি।
উইকেট কীপারের স্ট্যান্স। দু'পায়ে সমান ভর। হাতের আঙ্গুল আলগোছে মাটিতে। হাতের তেলো বোলার মুখো।

বল বোলারের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র হাত দুটি মাটি থেকে তু'লে সামনে আনবে। পরে দু' হাত মিলিয়ে একটা বাটির মতো করবে, যার ভিতরে বলটা এসে ঢুকবে। দু' হাতের

৩৯ নং ছবি।
বল ডেলিভারীর মুহূর্তে উইকেট কীপারের ভঙ্গি। হাত সামনে আনা হয়েছে। শরীর ও হাঁটু তখনও নীচু আছে, দৃষ্টি বলের দিকে।

কড়ে আঙ্গুল দুটি জড়িয়ে রাখলে বল হাতের ফাক দিয়ে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। অস্ট্রেলিয়ার ওল্ডফিল্ডকে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা উইকেট কীপার বলা হয়। তাঁর ছিল এই কায়দা। এখন যিনি ইংলণ্ডের সেরা উইকেট কীপার সেই গডফ্রে এভান্স স্বীকার করেছেন, কড়ে আঙ্গুল দুটি জড়িয়ে রাখার কৌশলটা তিনিও ওল্ডফিল্ডের কাছেই শিখেছেন।

বলটা স্টাম্পের মাথা সমান বা আর একটু সামান্য উঁচুতে ধরতে হয়। ক্যাচ লোফার মতো উইকেট কীপিং-এর বেলায়ও 'গিভ' দরকার। নয় তো বলটা হাত থেকে ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা। বল ধরতে হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলি কিন্তু সর্বদা মাটি-মুখো থাকবে। খবরদার, কখনও যেন আঙ্গুলের
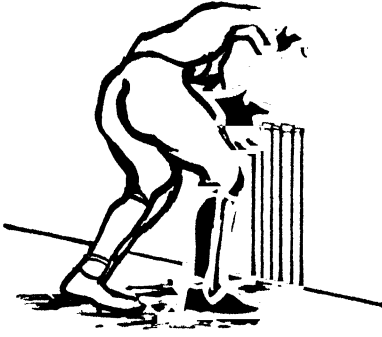
৪০ ছবি নং।
উইকেট কীপার বলটা স্টাম্পের মাথা সমান উঁচুতে ধরছে। শরীর সম্পূর্ণ বলের পিছনে।

ডগা বল-মুখো করো না,— আঙ্গুলে শক্ত চোট লাগবে। যদি কাঁধের সমান বা আরও বেশী উঁচুতে বল ধরতে হয়, তবে আঙ্গুলের ডগা থাকবে আকাশ-মুখো।
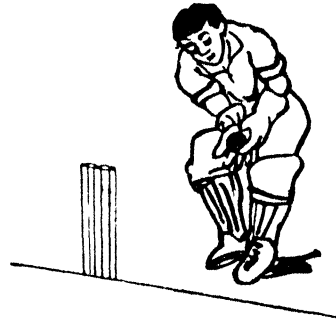
৪১ নং ছবি।
উইকেট কীপার লেগের দিকে বল ধরেছে। সমস্ত শরীর বলের পিছনে, দৃষ্ট বলের উপরে।

বেশী অফের বল ধরতে ডান পা সরিয়ে নেবে অফের দিকে, পিছনে নয়। লেগের বল ধরাই সব চেয়ে শক্ত। একচল্লিশ ও বিয়াল্লিশ নম্বর ছবিতে তার হদিশ দেওয়া হলো। স্টাম্পড করার সুযোগ

থাকুক আর না-ই থাকুক, ফি বারই অফে বা অনে বলটা ধরার সঙ্গে-সঙ্গেই তা' স্টাম্পের কাছে ফিরিয়ে আনতে অভ্যাস করবে।

উইকেট কীপার সব চেয়ে বেশী কাজে লাগায় চোখ। ব্যাটসম্যানরা জানে, সর্বক্ষণ বলের উপর কড়া নজর রাখতে হয়। উইকেট কীপারের বেলায় চোখের কাজ তার চাইতেও বেশী।

সে যে শুধু বোলারের বল দেওয়ার ভঙ্গি, বলের ফ্লাইট, পিচ খাওয়ার পরে বলের লাইন লক্ষ্য করে তা' নয়, ব্যাটসম্যানের উপরও তা'র দৃষ্টি থাকা চাই। অবশ্য একই সঙ্গে বল ও ব্যাটসম্যানের উপরে চোখ রাখা চলে না। সুতরাং বলটা যতক্ষণ দু' হাতের মুঠোর মধ্যে না পুরেছো, ততক্ষণ ব্যাটসম্যানের পা ক্রীজের ভিতরে আছে, কি, নেই সে-দিকে নজর দিও না। অনেক উইকেট কীপার স্টাম্পড করার উৎসাহে বল ধরার আগেই ব্যাটসম্যানের পায়ের দিকে তাকায় আর অমনি বল ফস্কে যায়। হাত দিয়ে আমরা খাবার মুখে পুরি। কিন্তু বেশী খাওয়ার আগ্রহে তাড়াতাড়ি হাতটা মুখে তুলতে গিয়ে খাবার যদি ফেলে দিই, তবে কিছু পেট ভরবে না। উইকেট কীপার যত তাড়াতাড়িই বেল উড়িয়ে দিক না কেন, বল তা'র হাতে না থাকলে তো ব্যাটসম্যান স্টাম্পড হবে না।

৪২ নং ছবি।
লেগের দিকে বল ধরার আর এক কৌশল।
'গভ' দেওয়া হচ্ছে।

বেশীর ভাগ এল. বি. ডব্লিউর 'য়্যাপিল' করে অর্থাৎ আম্পায়ারের কাছে আউটের আবেদন জানায় বোলার আর উইকেট কীপার। তা'রা দু' জনে বলের লাইনটা ভালো দেখতে পায়। খুব নিশ্চিত না হয়ে য়্যাপিল করবে না। কিন্তু য়্যাপিল যখন করবে, তখন চেঁচিয়ে আর খুব জোর দিয়ে বলবে, "হাউজ্ দ্যাট" (how's that) ? ইংলণ্ডের পুরানো উইকেট কীপার জর্জ ডাকওয়ার্থ,—এখন যিনি কমনওয়েলথ টীমের ম্যানেজার—তাঁ'র "হাউজ্ দ্যাট" মাঠের প্রায় সিকি মাইল বাইরে থেকেও শোনা যেতো !

উইকেট কীপারের বল ধরা ও ক্যাচ লোফা অনেক সময়েই দেখতে যেমন চমৎকার, তেমনি আশ্চর্যজনক। কিন্তু কোনো কোনো উইকেট কীপার বাহবা কুড়োবার লোভে বল ধরার চাইতে বাহাদুরি দেখাতেই যেন বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে অভ্যাস মারাত্মক। ওল্ডফিল্ডের উইকেট কীপিং-এর প্রশংসা আজও প্রায় চলতি প্রবাদের মতো লোকের মুখে মুখে ফেরে। অথচ তাঁর বল ধরা ও ক্যাচ লোফার ভঙ্গি ছিল একেবারে সাদাসিধে। উইকেট কীপার সর্বদা মনে রাখবে, সে ক্রিকেট-দলের লোক; সার্কাসের নয়। যদিও সুদক্ষ উইকেট কীপারদের কোনো কোনো ক্যাচ লোফা ও স্টাম্পড করা অনেক সময় সার্কাসের খেলোয়াড়দের কৌশলকেও হার মানায়।

ক্রিকেটের গল্প

ব্যাটসম্যান যে কত ভাবে আউট হয় তা' আগে বলেছি। বোল্ড, কট য়্যাণ্ড বোল্ড, কট, স্টাম্পড, রান আউট, হিট উইকেট—এ সমস্তই ব্যাটসম্যানের মৃত্যুবান। তা' ছাড়া খেলতে খেলতে ব্যাটসম্যানের মাথার টুপি, চোখের চশমা বা পকেটের রুমাল পড়ে গিয়ে বেল ফেলে দেওয়ার ঘটনাও দু' একটা যে না শোনা যায় এমন নয়। 'হ্যাণ্ডল্ড দি বল' হলো আউট হওয়ার আর একটা কারণ যা' খুব কদাচিৎ দেখা যায়।

ফুটবল খেলে' ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানকে আউট করার কথা কেউ কোনোদিন শুনেছে কি? শোনা দূরে থাক, কেউ ভাবেও নি। অথচ সত্যি সত্যি তা' ঘটেছে এবং মাত্র কয়েক বছর আগেই ঘটেছে। যে-ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন, তিনি আমাদের ভারতবর্ষেরই একজন অতি নামজাদা খেলোয়াড়,—বিজয় মার্চেণ্ট। যিনি আউট করেছেন তাঁকেও ভারতবর্ষের অনেকেই খেলতে দেখেছে। তাঁ'র নাম ডেনীস কম্পটন। কম্পটন শুধু যে একজন বড় ক্রিকেটার তা' নয়, ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁ'র জগৎ-জোড়া খ্যাতি আছে। বিলাতের নামজাদা ফুটবল টীম আর্সেনেলের তিনি লেফট আউট ছিলেন। গত যুদ্ধের সময় কলকাতার ময়দানে তাঁকে যারা গোল করতে আর ইডেন গার্ডেনসে

রান করতে দেখেছে, তারা অনেকে এখনও ঠিক করে' উঠতে পারে নি, ফুটবল আর ক্রিকেটের মধ্যে কম্পটন কোনটা বেশী ভালো খেলেন।

যুদ্ধের ঠিক পরেই ওভালে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলছিল। ওপেনিং ব্যাটসম্যান মার্চেণ্ট যখন ১২৮ রান করেছেন তখন একটা মারে দু' রান নেওয়ার চেষ্টা করলেন। কম্পটন ছিলেন শর্ট লেগে। তিনি ছুটে বলের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন, উবু হয়ে সেটা কুড়িয়ে তার পর উইকেটে ছুঁড়তে যতটা সময় লাগবে ততক্ষণে মার্চেণ্ট নিজের ক্রীজে পৌঁছে যাবেন। সেই মুহূর্তে কম্পটন বাঁ পা দিয়ে বলটা কিক করলেন উইকেটের পানে। চক্ষের পলকে বলটা স্টাম্প উপড়ে ফেললো।! মার্চেণ্টের চক্ষু স্থির! মাঠের অন্যান্য ফিল্ডারেরা অবাক!! দর্শকরাও এমন হকচকিয়ে গেছে যে, কারো মুখে কথা নেই। শুধু আম্পায়ার তর্জনী তুলে ধরলেন উপরের দিকে। আউট।

চার দিক থেকে হাততালি বাজতে লাগলো প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে। মার্চেণ্ট হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত ধারা আউট এর আগে বা পরে আর কখনও ঘটে নি।

পা কাজে লাগিয়ে কম্পটন যেমন ভারতবর্ষের সেরা ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন, পায়ের জন্যে আবার আউটও হয়েছেন। অবশ্য নিজের পা নয়, অন্যের। খেলাটাও টেস্ট ম্যাচ নয়।

মার্চেণ্ট আউট হওয়ার প্রায় ছ' বছর পরের ঘটনা। লর্ডসে

সারে দলের বিরুদ্ধে কম্পটন ব্যাট করছিলেন। আর্থার ম্যাকেণ্টায়ার সারে দলের উইকেট কীপার। কম্পটন একটা বলকে কষে হুক করে পাঠাবার চেষ্টা করলেন লেগ বাউণ্ডারীতে। ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্ডিং করছিলেন এরিক বেডসার। বলটা তা'র পায়ে লেগে পিছনে ছিটকে গিয়ে পড়ল একেবারে ম্যাকেণ্টায়ারের মুঠোর মধ্যে। ব্যস, আউট। কট বিহাইণ্ড।

এরিক বেডসারের নাম শুনে কেউ যদি ভেবে থাকো যে, ওটা ছাপার গলদ,—আসলে এলেক বেডসার হবে, তবে কিন্তু মস্ত ভুল। এলেক বেডসার খুবই নাম করা বোলার, সন্দেহ নেই। ব্র্যাডম্যান তো বলেন, এলেকের চাইতে ভালো মিডিয়ম পেস বোলার তিনি আর দেখেনই নি। কিন্তু এরিক বেডসার নামেও একজন ক্রিকেটার আছেন, এবং খেলোয়াড় হিসাবে তিনিও একেবারে নগন্য নন। এলেক বেডসার বল দেন সুইং এবং লেগকাটার। এরিক বেডসার দেন, স্পিন। ব্যাটিং-এ অবশ্য এলেকের চাইতে এরিক ভালো। দুজনের যে নামের মিল আছে তা'র কারণ তাঁ'রা দু' ভাই। তাঁ'দের চেহারাও হুবহু এক। তা'র কারণ তাঁ'রা জমজ। বাস্তবিক, দু' ভাই-এর চেহারায় এতই মিল যে, তাঁ'দের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত সব সময়ে ঠিক চিনতে পারে না, কে এলেক, আর কে এরিক! এই নিয়ে ভারি মজার গল্প আছে।

দু' ভাই যখন স্কুলে পড়তেন, তখন এক দিন ওকিং দলের পক্ষে তাঁ'রা খেলতে গেছেন। এরিক বত্রিশ রান করে আউট হলেন। ঠিক তার পরেই এলেকের ব্যাট করার পালা। প্যাভিলিয়ন

থেকে ব্যাট হাতে এলেক যেই এসে পপিং ক্রীজে দাঁড়িয়ে ব্লক নিতে যাবেন অমনি স্কোয়ার লেগের আম্পায়ার কটমট করে' তাকিয়ে কড়া সুরে বললেন, "এ কী? তুমি দু' বার ব্যাট করতে এসেছো কেন?"

এলেক বললেন, "না সার, দু' বার নয়। আমি তো এই প্রথম ব্যাট করতে এলেম।"

আম্পায়ার আরও চটে গেলেন।

"এই প্রথম? আমার সঙ্গে চালাকি? এই মাত্র তুমি আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে যাও নি? আমি কি চোখে দেখতে পাইনে, ভেবেছো?" বললেন আম্পায়ার।

এলেক তখন আম্পায়ারকে বুঝিয়ে বললেন, এই মাত্র যে ব্যাটসম্যান আউট হয়েছে সে তার জমজ ভাই। আম্পায়ারের বিশ্বাস হয় না। শেষকালে এরিক প্যাভিলিয়ন থেকে ফিরে এসে এলেকের পাশে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করলেন যে, একই ব্যাটসম্যান দু' বার ব্যাট করতে আসে নি।

আম্পায়ার দু' জনকে খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করে' হতাশ ভাবে বললেন,—"বুঝলেম, তোমরা এক লোক নও, দুজন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে যে আউট হয়েছো তা' চিনবো কী করে?" তা' বোঝাবার অবশ্য কোনো উপায় ছিল না।

এলেক আর এরিক বরাবর একই দলে খেলেছেন। স্কুল ছেড়ে যখন বড় ম্যাচে খেলার সময় এল, তখন দু' জনই সারে কাউন্টিতে যোগ দিলেন। বছর আটেক আগে সারে কাউন্টির শত বার্ষিকীর জন্যে টাকা তুলতে "ওল্ড ইংলণ্ডের" সঙ্গে এক ম্যাচ

হচ্ছিল। ওল্ড ইংলণ্ডের পক্ষে খেলতে নামলেন পুরানো দিনের বিখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড়েরা—যাঁদের নাম আজও লোকের মুখে মুখে ফিরছে। পি. জি. ফেণ্ডার ক্যাপ্টেন। আম্পায়ারও হলেন বিলাতের ক্রিকেটের দুই দিকপাল—জ্যাক হবস (এখন যিনি সার জন হবস) আর হার্বার্ট স্ট্রাডউইক—যিনি এককালে ইংলণ্ডের টেস্ট উইকেট কীপার ছিলেন।

বেডসার দু' ভাই সারে দলে খেলছিলেন। ব্যাট করছিলেন ফ্রাঙ্ক উলী। হঠাৎ এরিকের একটু দুষ্টুমি করার লোভ হলো। বুড়ো জ্যাক হবস আর ফ্রাঙ্ক উলীকে নিয়ে একটু মজা করলে হয় না? তক্ষুনি এলেকের সঙ্গে পরামর্শ করে ফন্দি ঠিক করে ফেললেন। এরিক বল দিচ্ছিলেন। এলেক ফিল্ডিং করছিলেন কভারে। ওভারের প্রথম তিনটা বল দিয়ে ফলো-থ্রু'তে এরিক এগিয়ে গেলেন সামনে, এলেক চলে এলেন বোলিং ক্রীজে। আম্পায়ার হবস বা অন্য আর কেউ তা' টের পেলেন না। এলেক বাকী তিনটে বল দিয়ে ওভার শেষ করলেন।

খেলার শেষে দু' ভাই সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে প্যাভিলিয়নে সবাই হেসে খুন। বুড়ো ফ্রাঙ্ক উলী হাসতে হাসতে বললেন, "তাই বলো, আমি ব্যাট চালাতে গিয়ে ভাবি, হঠাৎ বলের গতি এমন বেড়ে গেল কী করে!"

জ্যাক হবসও মজাটা পুরোপুরি উপভোগ করে' বললেন, "ওহে জমজ-বোলার, তোমাদের যে দেখছি কবে এক দিন সেই দামু আর চামুর দশা হবে। চামুর মহৎ কাজের জন্যে দামুর হইত নাম; দামুর জিনিষ কিনিলে সকলে, চামুর মিলিত দাম।"

হবস ঠাট্টা করে যা' বলেছিলেন, সত্যি সত্যি তাই একদিন ঘটলো। লর্ডসে´ সারে আর এম. সি. সি'র ম্যাচে দু' ভাই খেলছিলেন। এলেক এমন সাঙ্ঘাতিক বল দিলেন যে চৌদ্দ রানে ছ'টি উইকেট পেলেন। সারে দল ড্রেসিং রুমে ফিরে এলে বিপক্ষ দলের ডেনীস কম্পটন এসে বোলারকে বললেন "এলেক, চমৎকার বল দিয়েছো আজ। অনেক দিন এত মারাত্মক বোলিং দেখিনি। কনগ্র্যাচুলেশানস্"। ডেনীস কম্পটন পিছন ফিরতেই দু' ভাই খুব প্রাণ খুলে হেসে নিলেন। কম্পটন পিঠ চাপড়ে গেলেন এরিককে, যিনি সে-দিন একটা উইকেট ও পান নি।

তোমরা ভাবছো—এরিকের তো খুব লাভ। এলেক করে আউট, আর অভিনন্দন পায় এরিক। হ্যাঁ, সেটা সুবিধার কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আবার উল্টো দিকও আছে। ছোট বেলায় হয়তো এলেক করেছে দুষ্টুমি, এরিক খেয়েছে তা'র জন্যে কান-মলা। বড় হয়ে এলেক টাকা ধার করলে পাওনাদারেরা হয়তো এরিককে দু' বেলা দেবে তাগাদা !

মজা করার জন্যে বেডসার জমজেরা দু' জনে হবস ও ফ্র্যাঙ্ক উলীকে ঠকিয়ে ছিলেন। ঠিক একই উদ্দেশ্যে অনেক বছর আগে আমাদের দেশেও একজন ক্রিকেটার আম্পায়ার এবং আর সবাইকে 'এপ্রিল ফুল' করেছিলেন। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগেকার কথা। ১৮৮৩ সালে বোম্বেতে ব্রিটিশ অফিসারস ও পার্শী দলের এক ঘরোয়া ম্যাচ খেলা হচ্ছিল। সাহেবরা টস জিতে' প্রথম ব্যাট করলেন। তা'র পরে এল পার্শীদের পালা। প্রথমে তাঁদের সব চেয়ে তুখড় যে ব্যাটসম্যান, তিনি

তিন রান করেই আউট হয়ে গেলেন। অন্য ব্যাটসম্যানরাও তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। সবাই যখন ভাবছে, পার্শীরা অনেক রানে হেরে যাবে তখন দশ নম্বর ব্যাটসম্যান এলেন ব্যাট করতে। তাঁর এক গাল লম্বা দাড়ি আর মাথায় এক মস্ত পাগড়ি।

সাধারণতঃ দলে সব চেয়ে যে ব্যাটিং-এ কাঁচা, সে দশ নম্বরে ব্যাট করতে আসে। বেশীর ভাগ এক দুই বলেই আউট হয়। কিন্তু এই ব্যাটসম্যানটিকে নিয়ে ব্রিটিশ অফিসারস দলের বোলার সব হিমশিম খেয়ে গেলেন। কিছুতেই আর তাঁ'কে আউট করা যাচ্ছে না। ড্রাইভ, কট, পুল হুক করে পর পর তিনি বাউণ্ডারী করছেন। ফিল্ডসম্যানরা তা'র মারের পিছনে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে উঠলো। কী আশ্চর্য ; অনেক রান করে দশ নম্বর ব্যাটসম্যানই শেষকালে পার্শীদের জিতিয়ে দিলেন !

মনের আনন্দে পার্শী দলের সমর্থকরা তাঁ'কে মাঠ থেকে কাঁধে তুলে জয়ধ্বনি করতে করতে প্যাভিলিয়নে নিয়ে চললো। হঠাৎ ব্যাটসম্যানের গাল থেকে দাড়ির গোছা খসে পড়ল মাটিতে। ও, হরি ! এ যে সেই গোড়াতে তিন রান করে আউট-হওয়া ব্যাটসম্যান ! নকল দাড়ি আর পাগড়ি পরে এসেছে !!
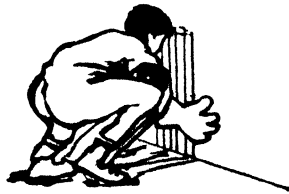
বলতে পারো ?

বন্ধুরা কে কতটা ক্রিকেটের খবর রাখে ও আইন কানুন জানে তা' পরখ করে দেখতে চাও ? নীচের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা কর। অবশ্য তা'র আগে নিজে কতটা জানো, তা'ও যাচাই করে' দেখা ভালো। প্রশ্নগুলির সঠিক জবাব আছে ১১৬ পৃষ্ঠায়। উত্তর নির্ভুল হলে কত নম্বর পাবে তা' প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে লেখা আছে।

১। কোন বছরে ভারতবর্ষ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে ? কার বিরুদ্ধে ? খেলা হয়েছিল কোথায় ? ৫

২। প্রথম টেস্টে ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন কে ? কে ছিলেন বিপক্ষ দলের ক্যাপ্টেন ? ৩

৩। একজন বোলার তা'র ওভারের শেষ বল দিয়ে বিপক্ষ দলের শেষ ব্যাটসম্যানকে আউট করল। ব্যাটিং দলকে ফলো অন করালে সেই বোলার কি নতুন ইনিংসে প্রথম বল দিতে পারে ? ৩

৪। প্রথম টেস্ট-সেঞ্চুরী করেন কে ? তিনি কোন দেশের লোক ? ৪

৫। একটা ফাস্ট বল প্রথমে ব্যাটসম্যানের পায়ে লেগে পরে ব্যাটে লাগল। ফিল্ডার বলটা মাটিতে পড়ার আগেই লুফে নিলে ব্যাটসম্যান আউট কি ? ৩

৬। ভারতবর্ষে কে বেশী ডবল সেঞ্চুরী করেছেন? ৪

৭। রনজি ট্রফি প্রথম জেতে কোন টীম? ৩

৮। কোন ভারতীয় সব চেয়ে বেশী টেস্ট ক্যাপ্টেন হয়েছেন? কতবার? ৪

৯। ভারতীয় দলের কোন ব্যাটসম্যান এক টেস্টে দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেছেন? ৩

১০। কোন বোলার এক ম্যাচে সব চেয়ে বেশী "কট য়্যাণ্ড বোল্ড" আউট করেছেন? ৪

১১। এক ম্যাচে কোন উইকেট কীপার সব চেয়ে বেশী ব্যাটসম্যান আউট করেছেন? ২

১২। এক ম্যাচে কোন ফিল্ডার (উইকেট কীপার ছাড়া) সব চেয়ে বেশী ক্যাচ লুফেছেন? কতগুলি? ৪

১৩। সব চেয়ে বেশী বার "হ্যাট-ট্রিক" করেছেন কোন বোলার? কত বার? ৩

১৪। সব চেয়ে বেশী বার এক ইনিংসে দশটি উইকেটই পেয়েছেন কোন বোলার? ৪

১৫। দু' ভাই এক টেস্টে একই দলে খেলেছেন এমন ভারতীয় কে কে? ২

১৬। ওভার-বাউণ্ডারী অর্থাৎ ছ'য়ের মার বোঝাতে আম্পায়ার কী ভাবে ইঙ্গিত করে? ৩

১৭। একজন বোলার প্রথম বলে অফ স্টাম্প, দ্বিতীয় বলে মিডল ও তৃতীয় বলে লেগ স্টাম্প উড়িয়ে দিল। চতুর্থ ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে এসে দেখল

একখানা স্টাম্প তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তাতে কোনো বারই বল লাগেনি। এ কি হতে পারে? ৩

১৮। কোন খেলোয়াড় সব চেয়ে বেশী বার টেস্ট-ক্যাপ্টেন হয়েছেন। তিনি কোন দেশের লোক? ৪

১৯। ভারতীয় দলের কোন খেলোয়াড় সব চেয়ে বেশী টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন? কত বার? ৪

২০। কোন ভারতীয় প্রথম পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে বিদেশে খেলেন? ৪

২১। কোন পেশাদার খেলোয়াড় প্রথম ইংলণ্ডের টেস্ট ক্যাপ্টেন হয়েছেন? ৫

২২। কোন টেস্ট ক্যাপ্টেন ভারতবর্ষে প্রাদেশিক গভর্নর হয়েছেন? ৪

২৩। কোন প্রধান মন্ত্রী ক্রিকেট টীমের ক্যাপ্টেন হয়েছেন? কোন সালে? ৪

২৪। ব্যাটসম্যান বল মেরে ফাইন লেগে পাঠালো। এক রানের জায়গায় দু' রান নেওয়ার সময় স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান ক্রীজের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আম্পায়ার তা'কে রান্ আউট দিলেন। কী করে' তা' সম্ভব? ৪

২৫। তিন ভাই এক টেস্ট ম্যাচে একই দলে খেলেছেন কা'রা? ৪

২৬। দু' ভাই টেস্ট ক্যাপ্টেন হয়েছে কা'রা? ৫

২৭। সব চেয়ে বেশী টেস্ট খেলেছেন কে? ৫

সঠিক উত্তর

আগের পৃষ্ঠার 'বলতে পারো ?' প্রশ্নগুলির জবাব ঃ—

১। ঊনিশ শ' বত্রিশ সালে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। লর্ডসে।

২। সি. কে. নাইডু। ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন,—ডি. আর. জার্ডিন।

৩। হ্যাঁ, পারে।

৪। অস্ট্রেলিয়ার সি. ব্যানারম্যান। ১৮৭৭ সালে।

৫। হ্যাঁ, আউট। কট।

৬। বিজয় মার্চেণ্ট। ১১টা।

৭। বোম্বে টীম।

৮। অমর নাথ। ১৫ বার।

৯। বিজয় হাজারে। অস্ট্রেলিয়ায়।

১০। ডব্লিউ. জি. গ্রেস। ৬ জন ব্যাটসম্যানকে।

১১। অস্ট্রেলিয়ার ডন টেলন ১৯৩৮ সালে এক ম্যাচে ৯ জন কট ও ৩ জন স্টাম্পড করেছেন। প্রায় ৮৫ বছর আগে বিলাতের পুলী ঐ রকম ১২ জনকে আউট করেছিলেন। ৮ জন কট, ৪ জন স্টাম্পড।

১২। ওয়েলী হ্যামণ্ড। ১৯২৮ সালে সারে ও গ্লস্টার-শায়ারের ম্যাচে দশটা ক্যাচ লোফেন।

১৩। ইংলণ্ডের ডি. ভি. পি. রাইট। ৭ বার।

১৪। বিলাতের এ. পি. এফ. ফ্রিম্যান। ৩ বার।

১৫। সি. কে. এবং সি. এস. নাইডু।

১৬। দু' হাত সোজা মাথার দু'পাশে উঁচুতে তুলে' ধরে।

১৭। হ্যাঁ। ৩ নম্বর ব্যাটসম্যান ছিল লেফট-হ্যাণ্ডার।

১৮। অস্ট্রেলিয়ার উডফুল। ২৫ বার।

১৯। হাজারে ও মানকাদ। দু' জনেই ৩০টা খেলেছেন।

২০। অমর সিং। ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ খেলায়।

২১। না, লেন হাটন নন। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম খেলায়ই (১৮৭৭ সালে) ক্যাপ্টেন ছিলেন সাসেক্সের পেশাদার ক্রিকেটার জেমস লিলী হোয়াইট। ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন য়্যালফ্রেড শ এবং আর্থার স্রুজবারীও পেশাদার ক্রিকেটার ছিলেন।

২২। লর্ড হ্যারিস বোম্বের ও স্ট্যানলী জ্যাকসন বাংলার।

২৩। জওহরলাল নেহরু। দিল্লীতে, ১৯৫৩ সালে।

২৪। স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান রানার নিয়ে খেলছিল। রানার ক্রীজে পৌছতে পারেনি, তাই ব্যাটসম্যান রান আউট।

২৫। ডব্লিউ জি. গ্রেস ও তাঁর দুই ভাই ই-এম এবং জি-এফ গ্রেস ১৮৮০ সালে ওভালের টেস্টে খেলেছিলেন।

২৬। বিলাতের এ-আর এবং এ-এইচ গিলিগন দু' ভাই ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জি-সি এবং আর-এস গ্র্যাণ্ট দু' ভাই।

২৭। ইংলণ্ডের ওয়েলী হ্যামণ্ড। ৮৫টা টেস্ট খেলেছেন।

চিত্র পরিচয়

৮ পৃষ্ঠার সামনে আর্ট প্লেট—লর্ডসে ক্যাপ্টেন হাজারে রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে দলের খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। রাণীর সঙ্গে করমর্দন করছেন সিন্ধে। তাঁর বাঁয়ে—রামচাদ; উম্রিগর ও মন্ত্রী। সিন্ধের ডাইনে,—ডি. কে. গায়কোয়াদ; পঙ্কজ রায়; পি. সেন ও ফাদকার। হাজারের কাঁধের উপর দিয়ে অধিকারী ও ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্তকে দেখা যাচ্ছে।

দু'পাতা জোড়া বড় ছবি—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্টে উম্রিগরকে রান আউট করার চেষ্টায় উইকেট কীপার লীগল ঝাঁপিয়ে পড়ে উইকেট ভেঙ্গে দিচ্ছেন। উম্রিগর অবশ্য এক সেকেণ্ড আগে ক্রীজে পেঁৗছে গেছেন। উল্টো দিকের ব্যাটসম্যান,—আপ্তে।

ঐ পৃষ্ঠায় নীচে বাঁ দিকের ছবি—মাঞ্চেস্টারের টেস্টে অমরনাথ বোল্ড। বেডসারের বলে মাঝের উইকেট উপড়ে' পড়ছে। বেল দুটি ছিটকে উঠেছে শূন্যে। উইকেট কীপার,—পি. এ. গিব।

ঐ পৃষ্ঠায় নীচে ডাইনে—ইংলণ্ডে ভিনু মানকাদ বল দিচ্ছেন।

৭৭ পৃষ্ঠার সামনে আর্ট প্লেট—(বাঁয়ে উপর থেকে নীচে) পাকিস্তানের বিখ্যাত বোলার ফজল মামুদ; ভারতের তরুণ অল রাউণ্ডার গদকারী; অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার রে-লিণ্ডোয়াল। (ডাইনে উপর থেকে নীচে) ইংলণ্ডের সেরা ফাস্ট-মিডিয়ম বোলার এলেক বেডসার; ভারতের তুখড় ফিল্ডার ডি. কে. গায়কোয়াদ; পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার খান মহম্মদ।

মলাটের ছবি—ভারতের বিখ্যাত স্পিন বোলার গোলাম আমেদ ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বল দিচ্ছেন।

ক্রিকেটের অভিধান

ক্রিকেটে কোন কথাটার কী মানে তা' এ-বই ও 'খেলার রাজা ক্রিকেট'-এ বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। তবুও তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়ার সুবিধার জন্যে নীচে ঐ শব্দগুলির একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া গেল। ইংলণ্ডে সমাজ ও জীবনে ক্রিকেট এত বেশী জায়গা জুড়ে আছে যে, স্বভাবতঃই ইংরেজী ভাষায় ক্রিকেটের অসংখ্য শব্দ ও সংজ্ঞা স্থান পেয়েছে। নীচের তালিকায় শুধু সর্বদা শোনা যায় এমন শব্দগুলিই আছে। 'ডেইজী কাটার' 'ক্যাসল' ও 'টিম্বার ইয়ার্ড' জাতীয় কম চলতি কথাগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

অন্—ব্যাটসম্যান বোলার-মুখো হয়ে দাঁড়ালে মাঠে তা'র বাঁ দিকটা।

অন সাইড প্লেয়ার—যে-ব্যাটসম্যানের বেশী মার অনের দিকে।

অফ ব্রেক—যে-স্লো বল পিচ খেয়ে লেগের দিকে বেঁকে যায়।

অফ সাইড প্লেয়ার—যে ব্যাটসম্যানের বেশী মার অফের দিকে।

অফ স্পিনার—অফ ব্রেকের অন্য নাম। যে-বোলার ঐ রকম বল দেয়।

অফ—ব্যাটসম্যান বোলার-মুখো হয়ে দাঁড়ালে মাঠে তা'র ডান দিকটা।

অল রাউণ্ডার—যে খেলোয়াড় ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং-এ পাকা।

ইন সুইঙ্গার—ফাস্ট বা মিডিয়ম পেস বোলারের যে-বল অফ থেকে অনের দিকে ধনুকের মতো বেঁকে যায়।

ইনিংস—এক দলের সব ব্যাটসম্যান আউট না হওয়া পর্যন্ত সময়। ম্যাচে সাধারণতঃ প্রত্যেক দল দুই ইনিংস করে' খেলে।

ইনিংস ডিফিট—একদলের দুই ইনিংসের মোট রান সংখ্যা বিপক্ষদলের এক ইনিংসের রান সংখ্যার চাইতে কম। শোচনীয় ভাবে হার।

ইয়র্কার—যে-বল ব্যাটসম্যানের ব্যাট যেখানে মাটি ছুঁয়েছে সেখানে পিচ খায়।

উইকেট—দুই দিকে তিনটি করে স্টাম্প। দুই উইকেটের মাঝখানের জায়গাটাকেও উইকেট বলে।

উইনিং দি টস—টস জেতা। কোন দল আগে পিটাবে তা' টসে জেতার উপর নির্ভর করে।

এক্সট্রা—যে-রান ব্যাটসম্যানের নামে দেখানো হয় না। বাই, নো-বল ইত্যাদি থেকে হয়।

এক্সট্রা কভার—অফ সাইডে একজন ফিল্ডার। তা'র দাঁড়াবার জায়গাটা ফিল্ডিং-এর ছবিতে দেখানো হয়েছে।

এজিং—বল ব্যাটের আনাচে-কানাচে লাগা।

এল. বি. ডব্লিউ—লেগ বিফোর উইকেট। আউট করার একটা উপায়। বলটা যদি ব্যাটসম্যানের উইকেট আড়াল-করা পায়ে লাগে। অবশ্য পা বলের লাইনে না থাকলে আউট নয়।

ওপেনিং ব্যাটসম্যান—যে দু' জন ব্যাটসম্যান প্রথম পিটাতে যায়। এক ও দু' নম্বর ব্যাটসম্যান।

ওপেনিং বোলারস—যে দুজন বোলার ইনিংসের প্রথম ও দ্বিতীয় ওভার বল দেয়।

ওপেনিং দি শোল্ডারস—জোরে পিটানো।

ওভার—বোলার এক বারে ক্রমাগত যে কয়টা বল দেয়। আজকাল ছ'টা বল দিলে এক ওভার হয়।

ওভার দি উইকেট—স্টাম্পের বাঁ দিক থেকে ডান-হাতি বোলারের বল দেওয়া।

ওভার-থ্রো—উইকেটে বল ছুঁড়ে দিলে তা' কেউ আটকাতে না পারা।

ওয়ান শর্ট—এক পপিং ক্রীজ থেকে আর এক পপিং ক্রীজ পর্যন্ত না পৌঁছেই আবার রান নিলে বলা হয় ওয়ান শর্ট।

ওয়াইড—ব্যাটসম্যানের নাগালের বাইরে দিয়ে যাওয়া বল।

কট—ক্যাচ লুফে আউট করা।

কট ইন দি ডিপ—বাউণ্ডারীর কাছাকাছি জায়গায় ক্যাচ লুফে আউট করা।

কট ইন টু মাইণ্ডস—এগিয়ে খেলবে, কি, পিছিয়ে খেলবে ঠিক করতে না পারার ফলে ব্যাটসম্যানের দোমনা ভাব।

কট বিহাইণ্ড—কট য়্যাট দি উইকেটেরই অন্য নাম।

কট য়্যাট দি উইকেট—উইকেট কীপার ক্যাচ লুফে আউট করার নাম।

কট য়্যাণ্ড বোল্ড—বোলার নিজে বল দিয়ে নিজেই ক্যাচটাও লুফে ব্যাটসম্যানকে আউট করা।

কভার পয়েন্ট—অফের দিকের একজন ফিল্ডার। 'খেলার-রাজা ক্রিকেট' বইতে ছবি দেওয়া হয়েছে।

কভারস—মাঠে অফের দিকে যেখানে কভার পয়েন্ট ও এক্সট্রা কভার দাঁড়ায় সেই অংশটা।

কলারিং দি বোলিং—ব্যাটসম্যান যখন স্বচ্ছন্দে পিটিয়ে রান তুলছে, বোলাররা কিছুই করতে পারছে না, তখন বলা হয় ব্যাটসম্যান বোলিং কলার করেছে।

কাট—ক্রস ব্যাটে অফের দিকে একটা মার।

কাউ শট—গুড লেংথ বলকে বেমক্কা মার দিয়ে মিড উইকেটের দিকে পাঠানো।

ক্যারি দি ব্যাট—ওপেনিং ব্যাটসম্যান দলের শেষ লোকটি আউট হওয়া পর্যন্ত নট আউট থাকা।

কীপিং দি লেংথ—ক্রমাগত গুড লেংথ বল দেওয়া।

কীপিং দি রান ডাউন—রান দাবিয়ে রাখার মতো বল দেওয়া।

কোটস—চলতি কথায় আম্পায়ারদের বলা হয় কোটস।

ক্রস ব্যাট—ব্যাট খাড়া না রেখে ঝাঁটার মতো চালিয়ে স্ট্রোক করা।

গালী—উইকেটে কীপারের কাছাকাছি ও তার সঙ্গে প্রায় এক লাইনে অফের দিকে ফিল্ডার।

গিভিং দি বল এয়ার—বল দিতে বলটাকে উঁচু দিয়ে ছোড়া।

গুগলী—লেগ ব্রেকের ভঙ্গিতে দেওয়া অফ ব্রেক বল।

গুড লেংথ—যে-বল পিচ খায় ব্যাটসম্যান থেকে খুব কাছেও নয় আবার খুব দূরেও নয়। লং হপ আর হাফ ভলীর মাঝামাঝি।

গেটিং অফ দি মার্ক—প্রথম রান করা। "ব্রেকিং দি ডাক"-এর অন্য নাম।

গ্ল্যান্স—লেগের দিকের বলকে ব্যাট দিয়ে ছুঁয়ে দেওয়া।

গ্লাইড—গ্ল্যান্স আর গ্লাইড একই কথা।

চান্স—আউট করার সুযোগ।

চীনাম্যান—বাঁ-হাতি বোলার যখন এমন বল দেয় যা' রাইট-হ্যাণ্ডার অর্থাৎ ডান-হাতি ব্যাটসম্যানের কাছে অফ ব্রেক।

চেঞ্জ বোলার—বোলার হিসাবে যার নাম নেই, কিন্তু দরকার হলে বল দেয়।

জাম্পিং আউট টু ড্রাইভ—ব্যাটসম্যান যখন বল পিটাতে পপিং ক্রীজ ছেড়ে সামনে এগিয়ে আসে।

টস—দুই ক্যাপ্টেন টাকা বা পেনী শূন্যে ছুঁড়ে ঠিক করে কোন দল আগে ব্যাট করবে। তার নাম টস।

টসিং দি বল আপ—খুব উঁচু দিয়ে বল দেওয়া। গিভিং দি বল এয়ারের অন্য নাম।

টাইমিং—বলটায় ব্যাট লাগাবার ঠিক সময়ে স্ট্রোক করা।

টুয়েলফথ ম্যান—দলের অতিরিক্ত খেলোয়াড়। এগারো জনের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তার বদলে সে ফিল্ডিং করে।

টেইল—যারা শেষের দিকে ব্যাট করে। দলের কাঁচা ব্যাটসম্যানরা।

টেইল এণ্ডার—শেষের দিকের একজন কাঁচা ব্যাটসম্যান। সাধারণতঃ আট, ন' এবং দশ নম্বর ব্যাটসম্যান।

টেকিং গার্ড—ব্লক নেওয়া।

টেকিং স্পিন—বল যখন পিচ খেয়ে বেঁকে যায়।

টেম্পটিং দি ব্যাটসম্যান—লোভ দেখিয়ে ব্যাটসম্যানকে ভুল স্ট্রোক করানো।

টেস্ট ম্যাচ—দুই দেশের মধ্যে সরকারী ভাবে প্রতিযোগিতা।

ডাক—চলতি বাংলায় যাকে বলা হয় গোল্লা। "ব্লব"-এরই আর এক নাম।

ডিক্লেয়ার—সব ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার আগেই কোন দল তাদের ইনিংস শেষ হয়েছে ঘোষণা করার নাম।

ডিগিং ইন—ব্যাটসম্যান যখন কোনো ঝুঁকি না নিয়ে উইকেটে টিকে থাকার জন্যে সাবধানে অনেকক্ষণ খেলতে থাকে, তখন তা'কে বলে ডিগিং ইন।

ডিপ—বাউণ্ডারীর কাছের এলাকা।

ডিফেন্সিভ ফিল্ড—রান বাঁচাবার জন্যে ফিল্ড সাজানো। য়্যাটাকিং ফিল্ডের বিপরীত।

ডেড ব্যাট—আত্মরক্ষামূলক খেলায় বলের মুখে ব্যাটখানা আলগোছে রাখা।

ডেলিভারী—বোলারের হাত থেকে বল ছাড়া।

ডোপিং দি উইকেট—নানা কৃত্রিম উপায়ে এমন ভাবে পিচ তৈরী করা যাতে বোলারের পক্ষে অসুবিধা।

ড্রাইভ—উইকেটের সামনে স্ট্রেট ব্যাটে খুব জোরে এক ধরনের মার।

নকিং দি বোলার অফ হিজ লেংথ—গুড লেংথ বলও খুব কষে পিটানো যাতে বেশী রান ওঠার ফলে বোলার ঘাবড়ে যায় এবং ফলে লেংথ ঠিক রাখতে পারে না।

নাইট ওয়াচ ম্যান—সাধারণতঃ শেষের দিকের ব্যাটসম্যান। দিনের শেষে অল্প আলোতে পাকা ব্যাটসম্যান যাতে হঠাৎ আউট না হয় সে জন্যে একে পাঠানো হয় কোনো মতে বাকী সময়টুকু কাটিয়ে দিতে।

নিউ বল বোলার—যে-বোলার প্রথম বল দেয়। সুইং বোলার।

নেট—ব্যাটিং ও বোলিং প্র্যাকটিসের জন্যে জাল-ঘেরা জায়গা।

নো-বল—যে-বল ঠিক নিয়ম অনুসারে দেওয়া হয় নি।

পপিং ক্রীজ—স্টাম্প থেকে চার ফুট আগে যে-দাগটায় দাঁড়িয়ে ব্যাটসম্যান বল পিটায়।

পয়েণ্ট—অফে ব্যাটসম্যানের কাছে ফিল্ডিং-এর একটা জায়গা।

পুটিং আপ দি শাটার্স—রান না তুলে' কেবল ঠেকিয়ে যাওয়া।

পেস বোলার—যারা জোরে বল দেয়।

পেয়ার অব স্পেক্ট্যাকলস্—ব্যাটসম্যান এক ম্যাচের দু' ইনিংসেই শূন্য করেছে। চলতি কথায় "দুটো গোল্লা"।

প্যাড—আঘাত বাঁচাবার জন্যে পায়ে পরার সরঞ্জাম।

প্লেইং ডাউন দি লাইন—ঠিক কায়দায় স্ট্রেট ব্যাটে খেলা।

প্লেসিং—মাঠের ফাঁকা জায়গা বেছে' বল মেরে' পাঠানো।

ফরোয়ার্ড প্লে—সামনের পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে খেলা।

ফলো-অন—কোনো দলকে পর পর দু' ইনিংস খেলতে বাধ্য করা।

ফলো-থ্রু—জোরে মারের পর ব্যাট ও শরীরকে যেভাবে রাখতে হয়। বোলার ও ফিল্ডারের ফলো-থ্রু বলতে বোঝায় বল দেওয়া বা ছোঁড়ার পরে শরীর সামলানো।

ফাইন লেগ—উইকেটের পিছনে লেগের দিকে ফিল্ডার।

ফার্মিং দি বোলিং—ব্যাটিং-এ কাঁচা জুটিকে বোলিং থেকে আড়াল ক'রে রাখার জন্যে কেবলই নিজে বোলারের মুখে থাকা।

ফার্স্ট ক্লাশ ক্রিকেট—যে-ম্যাচ তিন দিনের কম নয় এবং প্রত্যেক দলে এগারো জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলা হয়।

ফ্লাইটিং দি বল—ব্যাটসম্যান যাতে বলটা কোথায় পিচ খাবে তা' ধরতে না পারে সেজন্যে বলের গতি বদল ক'রে ও কম বা বেশী উঁচু দিয়ে বল দেওয়া।

ফিল্ড সেটিং—ফিল্ড সাজানো।

ফুল চেস্টেড—ব্যাটসম্যানের দিকে বুক দেখিয়ে বল দেওয়া, ব্যাটসম্যানের পক্ষে বোলারের দিকে বুক দেখিয়ে স্ট্যান্স নেওয়া।

ফুল টস—যে-বল মাটিতে না প'ড়ে সোজা স্টাম্পের উপর পড়বে।

ফোর্সিং এ ড্র—খুব চেষ্টা করে হার বাঁচানো, বিপক্ষ দলের ম্যাচ জেতা আটকানো।

বডি লাইন বোলিং—লেগে খুব কাছাকাছি ফিল্ডার রেখে ব্যাটসম্যানের

গা তাক ক'রে এমন শর্ট ফাস্ট বল দেওয়া যা' পিচ খেয়ে অনেকখানি লাফিয়ে ওঠে।

বাউণ্ডারী—মাঠের চারদিকের দাগ দেওয়া সীমানা। যে-বল ঐ লাইন পার হয়ে যায় তাকেও বাউণ্ডারী বলে।

বাউন্সার—বাম্পার আর বাউন্সার একই কথা।

বাটার ফিঙ্গারস—যে-ফিল্ডার কেবলই ক্যাচ ফেলে দেয়।

বাম্পার—বলটাকে খুব উঁচুতে লাফিয়ে তুলতে ফাস্ট বোলার যখন ইচ্ছে করে শর্ট পিচ বল দেয়।

বাম্প বল—ব্যাটে লাগার পর মাটিতে পড়ে' লাফিয়ে-ওঠা বল যা' দেখে মনে হয় যেন ক্যাচ।

বিটিং দি ক্লক—সময় কম থাকা সত্ত্বেও জেতা, বা হার বাঁচাতে যত দরকার তত রান করা।

বিটিং দি ব্যাটসম্যান—ব্যাটসম্যান বল মারতে চেষ্টা করেও যদি তা' ব্যাটে লাগাতে না পারে তবে বলা হয় বোলার ব্যাটসম্যানকে বিট করেছে।

বিলিয়ার্ড টেবিল—ব্যাটিং-এর পক্ষে খুব সুবিধাজনক পিচ।

বেল—স্টাম্পের উপরে ছোট দুটি কাঠের টুকরো।

বোল্ড—বল দিয়ে স্টাম্প উপড়ে' বা স্টাম্পের মাথার বেল ফেলে দিয়ে ব্যাটসম্যানকে আউট করা।

বোলিং উইথ হেড—বুদ্ধি খাটিয়ে বল দেওয়া।

বোলিং ক্রীজ—বোলারের দিকে স্টাম্পের দু' পাশের লাইনটা।

বোলিং চেঞ্জ—বোলার বদল করা।

ব্যাক লিফট—বল পিটাতে ব্যাট পিছনে তোলা।

ব্যাক স্ট্রোক—বাঁ পায়ে ভর দিয়ে পিটানো।

ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগ—ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি অথচ পিছনে অনে যে-ফিল্ডার দাঁড়ায়।

ব্যাকিং আপ—বোলারের হাত থেকে বল ছাড়া পাওয়ার মুহূর্তেই নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের রান নিতে এগিয়ে যাওয়া।

ওভার-থ্রো বাঁচাতে ফিল্ডার যে-উইকেট আগলে দাঁড়ায়, তাকেও ব্যাকিং আপ বলে।

ব্যাটসম্যান'স প্যারাডাইজ—যে-পিচে বোলার মোটেই সুবিধা পায় না, ব্যাটসম্যানেরা কষে' পিটাতে পারে।

ব্যাটিং গ্লাভস—ব্যাটসম্যান হাতে আঘাত বাঁচাবার জন্যে যে-দস্তানা পরে।

ব্যাড লাইট—সন্ধ্যে হয়ে এলে বা মেঘলা দিনে মাঠে দিনের আলো কমে' যাওয়া।

ব্যারাকিং—দর্শকদের দুয়ো দেওয়া।

ব্রেকিং উইকেট—বল দিয়ে বা ছুঁড়ে উইকেট ভেঙ্গে দেওয়া। আউট করার উপায়।

ব্রেকিং দি ডাক—শূন্য কাটিয়ে ওঠা। অর্থাৎ প্রথম রান করা।

ব্লক নেওয়া—স্টাম্পের সামনে ব্যাট খাড়া করে' ব্যাটসম্যান আম্পায়ারের কাছ থেকে জেনে নেয় ব্যাটখানা মিডল বা লেগ স্টাম্পের লাইনে আছে কি না। এর আর এক নাম গার্ড নেওয়া।

ব্লকিং—ব্যাট দিয়ে বল শুধু আটকানো, রান না নেওয়া।

ব্লব—ব্যাটসম্যান শূন্য করার নাম।

মিড অন—লেগের দিকে মিড অফের ঠিক উল্টো।

মিড অফ—ব্যাটসম্যানের সমুখ দিকে অফের ফিল্ডার।

মিড উইকেট—ব্যাটসম্যানের সুমুখ দিকে অনের ফিল্ডার।

মিডিয়ম পেস—যে-বল খুব জোরে নয় আবার খুব আস্তেও নয়।

মেডেন ওভার—যে-ওভারে ব্যাটসম্যান একটা রানও করে নি।

য়্যাকশান—বোলারের বল দেওয়ার ভঙ্গি।

য়্যাগ্রেসিভ ব্যাটিং—রান তোলার জন্যে কষে পিটানো।

য়্যাটাকিং ফিল্ড—ক্যাচ লুফে আউট করার জন্যে ফিল্ড সাজানো। এতে ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি বেশী ফিল্ডার রাখতে হয়।

য়্যাপিলিং—আম্পায়ারের কাছে আউটের বা দিনের আলো কমে' এলে আবেদন। আউটের আবেদনে বলতে হয় "হাউজ দ্যাট ?"

য়্যাওয়ে সুইঙ্গার—ফাস্ট বা মিডিয়ম পেস বোলারের বল যা' ধনুকের মতো বেঁকে অফের দিকে যায়।

য়্যালং দি কারপেট—বলটাকে মেরে মাটি দিয়ে গড়িয়ে পাঠানোর নাম হিটিং য়্যালং দি কারপেট।

রং আন—গুগলীর আর এক নাম।

রাউণ্ড দি উইকেট—স্টাম্প বাঁয়ে রেখে ডান-হাতি বোলারের বল দেওয়া।

রান আউট—ব্যাটসম্যান দৌড়ে ক্রীজে পৌছার আগে বল ছুঁড়ে উইকেট ভেঙ্গে দিলে রান আউট।

রান-আপ—ডেলিভারীর আগে বোলিং ক্রীজে পৌছতে বোলারের গতি।

রানার—অসুস্থ ব্যাটসম্যানের হয়ে দৌড়োবার লোক।

রাবার—এক মরশুমে সব ক'টা টেস্ট ম্যাচ মিলিয়ে এক রাবার।

রিটার্ন ক্রীজ—বোলিং ক্রীজের দু' মাথায় সমকোণভাবে ছোট লাইন দুটো।

র‍্যাবিট—একেবারে কাঁচা খেলোয়াড়।

লং অফ—অফের দিকে দূরের ফিল্ডার। ফিল্ডিং-এর ছবি দেখ।

লং অন—বোলারের ডাইনে বাউণ্ডারীর কাছে ফিল্ডার।

লং লেগ—অনে বাউণ্ডারীর কাছে ফিল্ডার। ফিল্ডিং-এর ছবি দেখ।

লং হপ—যে-বল ব্যাটসম্যান থেকে দূরে পিচ খায়। অন্য নাম শর্ট-পিচ।

লং হ্যাণ্ডল—জোরে পিটানো।

লফটিং—বলটা মেরে উঁচু দিয়ে পাঠানো।

লাইফ—আউট হওয়ার সুযোগ দিয়েও ফিল্ডারের ত্রুটিতে ব্যাটসম্যান বেঁচে যাওয়া।

লিফট—বলটা পিচে পড়ে যতখানি লাফিয়ে ওঠে।

লিভিং দি বল এলোন—না পিটিয়ে বল ছেড়ে দেওয়া।

লিভিং দি ব্যাটসম্যান—বলটা পিচ খেয়ে বা পিচ খাওয়ার আগেই অফের দিকে চলে যাওয়া।

• লুজ বল—যে বলের লেংথ ঠিক নেই।

লেগ থিওরী—লেগের দিকে অনেক ফিল্ডার রেখে লেগ স্টাম্প বা তা'র সামান্য একটু বাইরে বল দেওয়া।

লেগ বাই—বল ব্যাটসম্যানের ব্যাট বা গ্লাভস ছাড়া শরীরের অন্য কোনো জায়গায় লেগে' দূরে গেলে যে রান নেওয়া হয়।

লেগ ব্রেক—স্লো বোলারের যে বল পিচ খেয়ে অফের দিকে বেঁকে যায়।

লেগ স্পিনার—লেগ ব্রেকের অন্য নাম। যে-বোলার লেগ স্পিন বল দেয়।

লেগ ট্র্যাপ—লেগে ব্যাটসম্যানের কাছে বেশী ফিল্ডার রাখা যাতে তা'রা ক্যাচ লুফে ব্যাটসম্যানকে আউট করতে পারে।

লেট কাট—ব্যাক ফুটে ক্রস ব্যাটের মার যাতে বলটা থার্ড ম্যান বা শ্লিপের দিকে যায়।

শক বোলার—যে-বোলার এক সঙ্গে অল্প কয়েক ওভারেব বেশী বল দেয় না। সাধারণতঃ ফাস্ট বোলার।

শর্ট পিচ—লং হপের অন্য নাম।

শর্ট বান—খুব কাছের মার থেকে তাড়াতাড়ি এক রান নেওয়া।

শর্ট লেগ—অনে ব্যাটসম্যানের কাছে ফিল্ডিং-এর একটি জায়গা।

শর্ট বল—লং হপের অন্য নাম।

শাইন—বলের উপরে চকচকে পালিশ।

শাটিং আপ য়্যান য়েণ্ড—লেংথ ও ডিরেকশান বজায় বেখে বল দিয়ে একদিকের ব্যাটসম্যানকে রান তুলতে না দেওয়া।

শুটার—যে বল পিচ খেয়ে খুব সামান্য লাফিয়ে জোরে সোজা ছোটে।

সাইট স্ক্রীন—বাউণ্ডাবী লাইনে দু' দিকে উইকেটের পিছনে বড় পর্দা।

সিটার—খুব সহজ ক্যাচ।

সিলী—ব্যাটসম্যানের সামনে ফিল্ডিং-এর জায়গা। ছবি দেখো।

সুইসাইড স্কোয়াড—বিশেষ ধরনের বলে যে-ফিল্ডাররা ব্যাটসম্যানের খুব কাছে লেগের দিকে দাঁড়ায়।

সেট—ব্যাটসম্যান হাত জমিয়ে ফেলার নাম।

সেঞ্চুরী—এক শ' রান করা।

স্কাইয়ার—খুব উঁচুতে তোলা ক্যাচ।

স্কোরার—যে-লোক খেলার রান ও আউট ইত্যাদির হিসাব লেখে।

স্কোয়ার লেগ—অনের দিকে ফিল্ডিং-এর একটা জায়গা। মাঠের কে কোথায় দাঁড়ায় সে ছবি দেখ।

স্টক বোলার—যে-বোলার লেংথ ও ডিরেকশান বজায় রেখে অনেকক্ষণ বল দিতে পারে এবং যার বলে বেশী রান হয় না।

স্টাম্পার—উইকেট কীপার।

স্টাম্পড—ব্যাটসম্যান বল মারতে পপিং ক্রীজের বাইরে পা নিয়ে গেলে উইকেট কীপার বল ধরে' যখন উইকেট ভেঙ্গে দেয় তখন ব্যাটসম্যান স্টাম্পড আউট হয়।

স্টিকী উইকেট—বৃষ্টির পরে মাঠ শুকোবার সময় পিচ যখন এমন হয় যে, বলটা পিচ খেয়ে সাঙ্ঘাতিক বেঁকে যায় বা লাফিয়ে ওঠে তখন তাকে বলে স্টিকী উইকেট। খুব পাকা ব্যাটসম্যানেরাও স্টিকী উইকেটে খেলতে অসুবিধা বোধ করে।

স্টিল এ রান—ফিল্ডারদের অমনোযোগ বা ঢিলেমির সুযোগে চট করে' এক রান নেওয়া।

স্টোন ওয়ালিং—শুধু আত্মরক্ষামূলক খেলে উইকেটে অনেকক্ষণ টিকে' থাকা।

স্ট্যান্স—ব্যাটসম্যানের দাঁড়াবার ভঙ্গি। উইকেট কীপারের বসার ভঙ্গিকেও স্ট্যান্স বলে।

স্ট্যাণ্ড—আউট না হয়ে এক জুটি ব্যাটসম্যান যতক্ষণ খেলে।

স্ট্রাইকার—যে-ব্যাটসম্যান উইকেট কীপারের দিকে দাঁড়িয়ে বল রুখছে। তা'র জুটি যে-বোলারের দিকে থাকে, তাকে বলে নন-স্ট্রাইকার।

স্ট্রেট ব্যাট—ব্যাট খাড়া রেখে বল পিটানো।

স্ট্রোক প্লেয়ার—যে-ব্যাটসম্যান নানা ধরনের মার জানে ও স্বচ্ছন্দে পিটিয়ে রান তোলে।

স্ট্রোক—মার।

স্ট্রিকী শট—অনিচ্ছাকৃত ব্যাটের আনাচে কানাচে লাগা মার।

স্পিড মার্চ্যাণ্ট—খুব ফাস্ট বোলার।

স্পিনার—স্লো বোলার, যারা বলটাকে ঘুরপাক খাওয়ায়।

স্পেল—বিশ্রাম না নিয়ে একটানা বল দেওয়ার মোট সময়। চলতি কথায় এক খেপ।

হাফ ভলী—যে-বল ব্যাটসম্যানের কাছে পিচ খায়।

হিট উইকেট—ব্যাটসম্যান পিটাতে গিয়ে যদি ব্যাট নিজের শরীর বা টুপি ইত্যাদির ঘায়ে নিজের উইকেটের বেল ফেলে দেয় তবে সে 'হিট উইকেট' আউট।

হিটার—যে-ব্যাটসম্যান খুব জোরে পিটায়।

হুইপিং দি বেলস—স্টাম্পড বা রান আউট করতে উইকেটের বেল ফেলে দেওয়া।

হুইপিং দি বল—জোরে অফ ব্রেক বল দেওয়া।

হুক—শর্ট পিচ বল কষে' মেরে' লেগের দিকে পাঠানো। ক্রস ব্যাটে ব্যাক ফুটের মার।

হ্যাটট্রিক—বোলার পর পর তিন বলে তিনটা উইকেট পেলে বলা হয় হ্যাটট্রিক।

এই লেখকেরই লেখা

খেলার রাজা ক্রিকেট

ব্যাটিং-এর সমস্ত সংকেত ও ক্রিকেটেব

নানা গল্প ও আলোচনা